দ্বিতীয় আততায়ী

মতি নন্দী

খুট খুট শব্দ। রীনার ঘুম খুব সজাগ। কান পেতে রইল আবার শোনার জন্য। ঘরের দুটো জানালাই খোলা। বাইরের দালানে রতন ঘুমোচ্ছে। সম্ভবত রান্নাঘরে বেড়াল ঢুকেছে। শব্দটা আবার হল। রীনার মনে হল বোধহয় ওপরের গৌতম বাবু। ফেরেন অনেক রাতে। খবরের কাগজের রিপোর্টার। কিছুক্ষণ আগে অফিসের গাড়ি ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছে গলির মুখে। তন্দ্রার ঘোরেও রীনা তা টের পেয়েছিল। লোকটির নানান বাতিক, হয়ত জুতোর তলা চেঁছে গোড়ালি ঠুকছে।

আবার শব্দ এবার একটু জোরেই।

রীনা ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। খুট-খুটুনিটা উপরে নয়, রান্না ঘরেও নয়, পাশের ছোট ঘরটাতেই যেন। ও ঘরটায় আছে ভাঙা তোরঙ্গ, বেতের ঝুড়ি, ছেঁড়া লেপ, শিশি-বোতল, মাদুর, পুরোনো জুতো আর যত রাজ্যের পুরোনো পত্র-পত্রিকা। দরজায় শিকল দেয়া থাকে।

দরজাটা এই ঘরের মধ্যেই। রীনা ভয় পেল। ফ্ল্যাটে সে আর রতন। হয়ত চোর ঢুকেছে কিংবা ঢোকার চেষ্টা করছে। গৃহস্থ সজাগ– এই ইঙ্গিতটুকু দিলে চোর নিশ্চয় পালাবে। রীনা গলা খাঁকাল। খুট খুট শব্দটা হতেই থাকায় ভাবল চোর নয়। রীনা ঘরের আলো জ্বালাল। চোখ পড়ল টেবলে। টেবিলটা ছোট ঘরের দরজার লাগোয়া। ফুলদানিটা কিনারে সরে রয়েছে। দরজাটা খুলবে কি খুলবে না ভাবতে ভাবতে সে টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিটা সরিয়ে রাখল। রতনকে তুলে এনে একসঙ্গে ঢোকা উচিত। দিনকাল যা পড়েছে। রতন বুড়ো মানুষ, তবুও যদি দাঁড়িয়ে থাকে অনেক ভরসা পাওয়া যাবে। গত পাঁচদিন হল রাহুল বাড়ি নেই। বাড়ির কেউই জানে না এখনো– তার স্বামী পাঁচদিন নিরুদ্দেশ। অকাতরে ঘুমোচ্ছে রতন। দাড়ি কামায় সাতদিন অন্তর। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। সামনের দুটো দাঁত নেই। হাত দুটো অসহায়ের মত পাশে ছড়ান। মায়া হল রীনার। হয়ত দেখা যাবে ইঁদুর লাফালাফি করছিল। দরকার নেই বুড়ো মানুষটার ঘুম ভাঙিয়ে। রীনা ফিরে এল। আলো নিভিয়ে খাটে শুতে যাচ্ছে, তখন আবার শব্দ। কেউ যেন ডাকছে, শব্দটা চাপা হলেও, বাড়ির

সদরে আগন্তুকরা এইভাবেই টোকা দেয়। কিন্তু ও ঘরের জানালায় তো মানুষ আসার কোন উপায় নেই। এক, যদি পাইপ বেয়ে গলি দিয়ে কেউ উঠে আসে। কে আসবে? চোর! তা হলে ডাকবার মত সুর তুলে টোকা দেবে কেন? তা হলে?

ভাবতে গিয়ে রীনার হাত-পা জমে যাবার মত অবস্থা হল এই গরমেও। সাবধানে দরজটার কাছে এসে শিকল খুলল। পাল্লাদুটো এঁটে রয়েছে। যাতে শব্দ না হয় তাই যথেষ্ট সময় নিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে খুলে ফেলল। সুইচ টিপে খেয়াল হল বাল্ব নেই। মেঝের জায়গা খুব অল্প। ধুলোয় কিচকিচ করছে। ভ্যাপসা বমি গন্ধ। শোবার ঘরের আলো খোলা দরজা দিয়ে যতটুকু এসেছে, তাতে একমাত্র জানালাটা ঠাওর করে রীনা এগিয়ে গেল ভয়ে ভয়ে। ঘষা কাচের পাল্লা। চেষ্টা করেও রীনা ও ধারে অন্ধকার থাকার জন্য কিছুই দেখতে পেল না। চাপা সুরে সে বলল, কে? উত্তর নেই। ওধার থেকে নখ দিয়ে যেন কেউ কাছে আঁচড় কাটল। জানালার কড়া ধরে রীনা সজোরে টানল। দীর্ঘদিন খোলা হয় না। একটু খানি কেঁপে পাল্লাদুটো আগের মতই রয়ে গেল। বাঁ হাতে একটা পাল্লা। চেপে আবার টানল, মনে হল ওধার থেকেও কেউ যেন তাকে সাহায্য করছে। একটা ক্যাঁচ শব্দ করে জানালা খুলে গেল। ছোট জানালাটা জুড়ে কোমর পর্যন্ত একটা মানুষের ছায়া। থর থর করে কেঁপে উঠল রীনা। অস্ফুটে বলল, কে? আমি, আমি রাহুল। ফিসফিসে গলাটা ভরাট, উত্তেজিত। রতন কি ঘুমোচ্ছে? হ্যাঁ

আলো নিবিয়ে বারান্দার দরজাটা খুলে রাখ, রতন যেন না জাগে, তাড়াতাড়ি। দমচাপা দ্রুত নির্দেশ দিল ছায়ামূর্তি।

রীনা শোবার ঘরে এল। আলো জ্বলছে, জানালাটা খোলা, পর্দা গুটিয়ে তুলে রাখা। পর্দা ফেলে সে জানালাটা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিল। রতনের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে সাবধানে খিলটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। ছায়ার মত মানুষটার ছায়া ঝুল বাবান্দার পাঁচিল টপকে ঢুকে এল। নিজেই খিল দিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিচ্ছিল। রীনা ফিসফিস করে বলল, রতন দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে।

তা হলে তুমি আগে যাও। রীনাকে অনুসরণ করে শোবার ঘরে এসে, দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালাল। যেন আগে থেকেই তৈরি ছিল রীনা। খাটে হেলান দিয়ে দুহাতে চোখ ঢাকল, পিছ ফিরল এবং উবুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে ধরল।

রাহুল বিব্রত হয়ে এপাশ ওপাশ চাইল। দরজা-জানালা সবই বন্ধ। ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এগিয়ে এল। ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, খিদে পেয়েছে, আছে কিছু? না বোধ হয়, দেখি রান্নাঘরে কিছু আছে নাকি। উঠে দাঁড়াল রীনা। কোনদিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, রাহুল হাত টেনে ধরল।

কোথায় যাচ্ছ?

রান্নাঘরে।

তাই বলে এত শব্দ করে। আগে আলো নেবাও, সাবধানে দরজা খুলে পা টিপে যাও। রীনা অবাক হয়ে রাহুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে তার বোধশক্তি ফিরে এল। আস্তে দরজা খুলল। অন্ধকারে রতন ঘুমোচ্ছে। আন্দাজে পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। রান্নাঘরে বালতিটা দরজার ধারেই ছিল, ঢোকামাত্র পায়ে লাগল।

কে? রতনের ঘুম ভেঙে গেছে। কাঠের মত রীনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি।

বৌদি।

হ্যাঁ

কি কচ্ছো?

রতন, উঠে রান্নাঘরে দরজায় এল। রীনা আলো জ্বালল। লেবু খুঁজতে এসেছি। কি রকম চোঁয়া ঢেঁকুর উঠছে। জ্বল দিয়ে খাব, দাঁড়াও আমি কেটে দি।

বুড়ো মানুষটি গত পাঁচ বছরে একবারও নিজেকে রাঁধুনি বা চাকর ভাবতে পারেনি। রীনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তার লেবু কাটা। রস নিংড়ে, মিশিয়ে গেলাসটা এগিয়ে দিল। রীনা এক চুমুকে শেষ করল। মনে হল সত্যিই তার তেষ্টা পেয়েছিল।

আর লাগবে? না থাক, তুমি ঘুমোও।

শোবার ঘরে এসেই রীনা অবাক। রাহুল নেই। খাটের তলা দেখল, আলমারির পাশটাও। নজরে পড়ল ছোট ঘরে দরজাটা বন্ধ। ওটা তো খোলাই ছিল এতক্ষণ। ঠেলতেই খুলে গেল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে রাহুল দাঁড়িয়ে। রীনা কে দেখে সে এগিয়ে এল। ইশারায় জানায় এই ঘরেই সে থাকবে। বালিশ আর বেডকভার দাও। রীনা জিনিসিগুলো দিয়ে দিল রাহুল কে। বাইরে যেমন শিকল দেয়া ছিল দিয়ে দাও। ঘর থেকে বেরিয়ে রীনা দরজা বন্ধ করল। আলো নিবোল। বিছানায় বসে ভাবল এবার সে কি করবে?

জায়গা নেই পাশ ফেরার মত। রাহুল কোন রকমে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে যত রাজ্যের জঞ্জাল আর বাজে জিনিস। গুমোট ভ্যাপসা গন্ধ। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানালাটা খোলা। বন্ধ করা উচিত। উঠতে গিয়েও সে উঠল না। স্নায়ুগুলো টানটান, যেন প্রত্যেকটিতে পাথর বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জানালাটা বন্ধ করে দিলে হাওয়া যেটুকু আসছে, তাও আসবে না, খোলাই থাক, রাতে বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। উত্তেজিত ক্লান্ত শরীরে ঘুম আসে না। তাড়া খাওয়া কুকুরের মত ছুটে বেড়াতে হয়েছে এই ক'টা দিন। ক'দিন ? এক সপ্তাহ..... এক মাস..... এক বছর? আজীবন? ঘরটা এত গরম! রীনার দেয়া বেডকভারটায় সে শুয়ে। সেটা এত মোটা বলেই বোধহয় গরমটা বেশি লাগছে। মেঝের ধুলোয় কিচকিচ করছে। ভ্যাপসা বাসি গন্ধ। ভাঙা কাঠের চেয়ারে জড়ো করে রাখা ছেঁড়া তোষকটা থেকে আরশোলার চলা ফেরার মত শব্দ হচ্ছে। এইসব জঞ্জাল, আরশোলা, ইঁদুর, পোকামাকড় নিয়েই তাকে থাকতে হবে। রাহুল ভাবল, বেঁচে আছি। এখনো ধরা পড়িনি। হয়তো বেঁচে যাব। বেঁচে থাকব। রীনাকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে। আবেগসর্বস্ব অল্প বুদ্ধির মেয়ে মানুষ। একটু নাটক করতে হবে, এই যা। রাহুলের ঠোঁট মুচড়ে গেল। রতন সর্বক্ষণই বাড়িতে, দিনের বেলায় হয়ত সুযোগ হবে না। রাতে এই ঘরে রীনাকে ডেকে একসময় সে ওকে বুঝিয়ে দেবে। কি বুঝিয়ে দেবে? কেন সে এমন একটা কাজ করে বসল? কিন্তু সেটা কি খুব সহজে কয়েকটা কথার জাল বুনে স্ত্রীকে বোঝানো যাবে? সে মনে করার চেষ্টা করল সেই রাতের ঘটনাটাকে। একটা উপন্যাসে বর্ণিত কয়েকটা পাতার মতন সে ব্যাপারটা পড়তে শুরু করল চোখ বুজে–

সকাল থেকে মেঘ, দুপুরে বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে। সন্ধ্যার পরই রাস্তা নির্জন। রাত তখন প্রায় আটটা। বাসস্টপ থেকে হেঁটে শর্টকাট করতে প্লাইউড কারখানার টিনের পাঁচিলের পাশ দিয়ে সে দ্রুত চলেছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে। সরু রাস্তাটায় আলো নেই। কারখানার ভেতরে একটা বাল্ব জ্বলছিল। কিন্তু তার যৎসামান্যই পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে আসতে পেরেছে। তার ডানদিকে মাঠ, যেটা প্লট করে বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বাড়ি ওঠেনি। মাঠের মধ্যে আগাছার ঝোপগুলো চাপড়া চাপড়া অন্ধকার হয়ে রয়েছে। মাঠের ওপাশে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে আলো জ্বলছে। একটা কাতর আর্তনাদ, আর ঝোপের আন্দোলনের শব্দ। সে থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, কে? কাতরানি আর শব্দ থেমে গেল। সেই সময় তার মনে হল দুটো লোক অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে চারধারে তাকিয়ে পাঁচিলের গা ঘেঁষে মাটিতে পোঁতা একটা দুহাত লম্বা খোটা দেখতে পেল। মাঠ থেকে একজন ছুটে আসছিল। তার চীৎকার শুনে সে বুঝতে পেরেছিল মেয়ে। বাঁচাও বাঁচাও-! তারপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মেয়েটির পিছনে ছিল একজন, সেও ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। শুধু এইটুকু ঘটনা। কিন্ত তার মাথায় কেন যে রক্ত উঠে এল, রাহুল গত চারদিনে বার কয়েক তার কারণ খুঁজেছে, পায়নি। বাঁশের খোঁটাটা ধরে ষোল ইঞ্চি বাইসেপসের বাহু টান দিতেই বৃষ্টি ভেজা নরম জমি থেকে সেটা উঠে আসে। যে লোক দুটো এগিয়ে আসছিল তারা হঠাৎই ঘুরে গিয়ে ছুটে পালায়। সে মাঠের মধ্যে ছুটে গেছিল। লোকটা তখন সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় বলেছিল, এক পা এগিয়েছিস কি চাকু চালিয়ে দেব। এই শুনেই

সে বা বাঁশের খোঁটাটা বসিয়েছিল লোকটার মাথায়। এরপর ও লোকটা দৌড়েছিল অন্তত তিরিশ গজ। তারপর চীৎকার করে পড়ে গেল। আর কি এক অন্ধ আবেগে সে লোকটার মাথায় পর পর ক্ষ্যাপার মত আঘাত করে গেছিল। তারপরই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে নিথর দেহটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আবছা আলো, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, স্তব্ধ, নির্জন চরাচর আর একটা মানুষের উবুড় হয়ে থাকা। দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল, ওটা একটা মৃতদেহ। তখনই মাথার মধ্যে কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল: রাহুল তুমি খুনী! এখন তুমি পালাও। তার পরই সে দৌড়ল।

দুই

জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে। রাহুল হাত বাড়িয়ে তরল সোনার মত রোদ তালুতে সংগ্রহ করল। হাতটা ঘুরিয়ে ধরতেই সোনায় মাখামাখি হয়ে গেল। হাতটা মেলে রেখে সে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

"এত দেরি করলে বাপু আমরা কিন্তু অন্য লোক দেখব। চমকে হাত সরিয়ে নিল রাহুল। জানালার উল্টোদিকে সামনের বাড়ির বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে ঠিকে ঝি আর বাড়ির গিন্নি। বুকে ভর দিয়ে সরীসৃপের মত পিছলে রাহুল পেছনে সরতেই দেওয়ালে পা ঠেকে গেল। সে ওদের দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ওখান থেকে ওরা কি দেখতে পাচ্ছে?

বোধ হয় না। ঘরটা বেশ অন্ধকার। তবু জানালাটা এক সময় বন্ধ করে দিতে হবে। রাহুল অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরেই বারান্দাটা ফাঁকা হয়ে গেল। কাকে যেন দাঁত মাজার জন্য তাড়া দিচ্ছে। ওদের বড় মেয়েটির সঙ্গে রীনার ভালই আলাপ আছে। নাম মায়া, বছর ষোল-সতেরো বয়স। আসা যাওয়া করে।

রাহুল উপুড় হয়ে পড়ে রইল মেঝেয় থুতনি ঠেকিয়ে। এই ছোট ঘরের দেয়ালের পরেই পাশের ফ্ল্যাট। চিনেমাটির বাসন ভাঙার শব্দ হল। ওপরের ঘরে কেউ চলাফেরা করছে। রাস্তায় একদল কচি গলা চিৎকার করল। সব থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটা কাকের কণ্ঠস্বর। প্রচুর শব্দ একসঙ্গে নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আলাদা করে এক একটা শব্দ বেছে নিতে গেলে বহুক্ষণ মন দিতে হয়। সে সময় কার আছে? পা দিয়ে ভাঙা তোরঙ্গে রাহুল ধাক্কা দিল। ফাঁপা শব্দ হল। সে জানে এ শব্দটা কেউ শুনতে পাবে না। শোনার জন্য কেউ কান পেতে নেই। তার জন্য কেউ কি ওঁত পেতে বসে আছে? কোলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আলাদা করে তাকে খুঁজে বার করবে? পুলিশ! গোয়েন্দারা কি ওঁত পেতে আছে? এখানে প্রতিদিন কি তারা খোঁজ করতে আসবে, নিশ্চয় না। নজর রাখবে, কিন্তু কাল রাতে কি তারা দেখেছে এ বাড়িতে তাকে ঢুকতে? নিশ্চয় না। তাহলে এতক্ষণে ওরা নিশ্চয় এসে পড়ত। রাহুল তোরঙ্গে আবার ধাক্কা দিল। এই শব্দটা তাকে ভরসা দিচ্ছে। অনেক কিছুর অধিকার তাহলে এখনো অটুট রয়েছে। অধিকারগুলো কি, তা অবশ্য নির্ধারণ করতে হবে। আপাতত বোঝা যাচ্ছে দিনের বেলাটা নিরাপদ। জানালার কার্নিশ ধরে একটা বেড়াল হেঁটে গেল। একবার ঘাড় ফিরিয়েছিল, সম্ভবত বন্ধ থাকা জানালাটা হঠাৎ খোলা দেখে। তবে ভ্রুক্ষেপ না করেই চলে গেল। তার মজা লাগল, অপেক্ষায় রইল কখন আবার ও ফিরে আসে। এভাবেই সে অপেক্ষা করত যখন সুধাংশুকে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্টের ঘরে যাবার জন্য বেয়ারা ডাকতে আসত। বলির পাঁঠার মতো সুধাংশু যেত। আর ডিপার্টমেন্টের তারা কয়েকজন মুখ লুকিয়ে হেসে অপেক্ষায় থাকত ওর ফিরে আসাটা দেখার জন্য। মত্ত ষাঁড়ের মত সুধাংশু ছুটে আসত, 'অসম্ভব, সন অফ এ বীচ, চাকরি ছেড়ে দেব'। রাহুল ডান পাটা পাশের দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পায়ে শক্ত কিছু একটা ঠেকতেই উঠে বসল। একটা হাতুড়ি। এই ফ্ল্যাটে প্রথম আসার দিন ঠেলাগাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে টেবিলের পায়াটা খুলে যায়। গৌতমের চাকর সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। ওর কাছ থেকে সে হাতুড়িটা চেয়ে নিয়েছিল। ফেরত দিতে ভুলে গেছে, ওরাও চেয়ে নিতে ভুলে গেছে। এত তুচ্ছ জিনিসটা। হাতুড়িটা রাখতে গিয়ে রাহুলের কি খেয়াল হল নিজের মাথায় সেটা বার কতক ঠুকল। ব্যথা লাগে, অথচ আরামও বোধ হল। রেখে দিল। বেড়ালটা আর ফিরছে না। আর তখনই তার মনে হল পাশের ঘরে কেউ যেন চলাফেরা করছে। কেউ যেন হঠাৎ গলা টিপে ধরল তার। অসহায়ের মত আত্মরক্ষার জন্যই যেন সে হাতুড়িটা শক্ত করে চেপে, কাঠ হয়ে বসে রইল। উৎকর্ণ হয়ে থাকল, কোন শব্দ নেই। বোধ হয় ভুল হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে দরজার পাল্লার জোড়ে চোখ রাখল। জোড়ের মাঝে পোস্টকার্ড গলে যায় এমন ফাঁক।

সেখানে ভ্রু লাগিয়ে তাকালে শোবার ঘরের এক চতুর্থাংশ দেখা যায়। এই অংশটির মধ্যে পড়ে টেবলের বাঁ-ধার খাটের উপরের দিক অর্থাৎ যেখানে বালিশগুলো রয়েছে, দেয়ালের সাদা অংশ যেটুকুতে ছবি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি নেই, ইজি চেয়ারের দুই হাঁটু, আর মাঝে মাঝে দরজার পর্দা, যখন হাওয়ায় নৌকার পালের মত ফুলে ওঠে। ঘরে কেউ রয়েছে। রাহুল কতকগুলো ব্যাপার এখন বুঝতে পারে। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে কিনা, কেউ কাছে পিঠে রয়েছে কিনা, নড়া চড়ার কতটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, চলাফেরার শব্দে কিসের ইঙ্গিত ইত্যাদি। ওর মনে হল ঘরে কেউ রয়েছে। কে থাকতে পারে? নিঃশ্বাস বন্ধ করে শব্দ শোনার চেষ্টা করল। তারপরই মনে হল, এত মনোযোগ দিয়ে মানুষটা কে আবিষ্কারের কি দরকার, এ তো রতন। এইভাবেই তো শব্দ হয় তার ঝাঁট দেবার। হাঁটুর কাছে কাপড় গুটিয়ে উবু হয়ে বসে। মসৃণ মেঝের সাবধানে ফুল ঝাঁটা টানে। কারণ রাহুল বিছানায়, সরকারিভাবে তখনো তার ঘুম ভাঙেনি। ঝাঁট দেবার ছপছপ শব্দটা সে পছন্দ করে না মোটেই। রাহুলকে ভয় করে রতন, ভালও বাসে। বরং রীনাকে যেন সে কিছুটা অপছন্দ করে। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলায় রীনা একদিন আপত্তি করেছিল। রীনাও বিশেষ পছন্দ করে না ওকে। রোজই রাহুলের কাছে ওর সম্পর্কে কিছু না কিছু বলত। বুড়া মানুষ, নিড়বিড়ে, এক মিনিটের কাজ দশ মিনিট লাগায় ইত্যাদি শুনে শুনেও রাহুল দ্বিতীয় কোন লোক নিয়োগের জন্য ব্যস্ত হয়নি।

না হওয়ার কারণ রতনের বয়স, আনুগত্য বোধ এবং পিতৃসুলভ চালচলন। ওর বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির মধ্যে। বরখাস্ত করলে কোথাও কাজ পাবে না। ফলে সে তটস্থ হয়ে থাকে এবং প্রাণপণে হুকুম তামিলের চেষ্টা করে। অথচ বয়সোচিত কারণেই সে এই সংসারের কর্তা গিন্নির সাংসারিক বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাবগুলো বিরক্তি প্রকাশ করে সুধারে দেয়। শেষোক্ত ব্যাপারটি রাহুলের ভালই লাগে। বারো বছর বয়সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে যেত টালী পার্কে, ফিরত ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ভাড়া ফাঁকি দিয়ে। একদিন মুখোমুখি হয়ে গেল কন্ট্রাকটরের। ট্রাম তখন জোরে চলেছে। এক বৃদ্ধ হাত চেপে তাকে আগলে ধরলেন– 'অ্যাঁ পালান হচ্ছে, নামতে গেলে যে পড়ে মরবে সে খেয়ালও কি নেই? চুপটি করে দাঁড়াও।' গলার স্বরে কিছু একটা ছিল, যাতে রাহুলের মনে হল কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে এই বুড়ো তার ভাড়া দিয়ে দেবে। কন্ডাক্টর চেয়েছিল বৃদ্ধ ভাড়া দেয়নি, হেসে বলেছিল– 'এই বয়সেই ফাঁকি দিতে শিখছে। বড় হলে যে পকেট মারবে।' ট্রাম দাঁড়াতেই রাহুল লাফিয়ে নেমে পড়ে। রাগে, অপমানে কানের ডগা জ্বালা করছিল।

তাদের সঙ্গে খেলতে যেত জ্যোতি নামে একটি ছেলে। চলন্ত ট্রাম থেকে নামায় ওস্তাদ ছিল। কন্ডাক্টরের তাড়া খেয়ে একদিন সে ডান পাটা ভাড়া হিসেবে চাকার তলায় দিয়ে দেয়। রাহুলের মনে হয়েছিল সেই বুড়োটা থাকলে জ্যোতি খোঁড়া হত না। তার মাঝে মাঝে মনে হত রতনই সেই বুড়োটা। মসৃণ মেঝের ওপর চেয়ার সরাবার শব্দ হল। রাহুলের মনে পড়ল, এভাবেই রীনা তাকে বিছানা ত্যাগের শেষ সংকেত জানাত। একদিনের কথা তার মনে পড়ল–

'আটটা বাজতে চলল বিছানা তুলবে কখন'? বলতে বলতে রীনা আয়নার কাছে মুখটা এগিয়ে এনে, সাবধানে টিপ পড়ল। বুক কোমর, পাছা এবং মুখটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান ভঙিতে দেখল।

'অত করে যে দেখছ দেখবে তো সেই বুড়োটা! সে জন্য সাজাগোজের কি দরকার? বুকের কাপড়টা একটু সরিয়ে দিও আর পাছাটা সুইং করিয়ে হেঁটো, তাহলেই কাজ হবে।' এই ধরনের কথা রীনার গা-সওয়া হয়ে গেছে। শুধু চট করে একবার দেখল রতন ঘরে আছে কিনা।

'নাও ওঠো খুব হয়েছে, ওই বুড়োটার জন্যই অ্যাসিসটেন্ট হেড মিস্ট্রেস হয়েছি, মনে থাকে যেন।'

'এবং হেড মিস্ট্রেসও হবে।'

রীনা গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। বুড়োটা অর্থাৎ সনৎপ্রসাদ কুমার যার বড়বাজারে ঝাড়া মসলার দোকান, দেশে জমি-জমা, পুকুর, দুখানা ফ্ল্যাট বাড়ি, একটি স্ত্রী, আটটি ছেলে-মেয়ে, মার নামে একটি স্কুল, বৃন্দাবনে বাবার নামে ধর্মশালা। কোষ্ঠ কাঠিন্যের অস্বস্তি, সন্তানাদি মানুষ না হওয়ার দুঃখ এবং যুবক থাকার ইচ্ছা প্রভৃতি আছে– তিনি রীনাকে স্নেহের চোখে দেখেন।

রাহুলের ধারণা– বুড়োটাকে যৌন ক্ষমতা হারাবার ভয়ে পেয়ে বসেছে। তাই রীনার সান্নিধ্যে চাঙ্গা হতে চায় এবং নিশ্চয় রীনা এজন্য তাকে সচেতনভাবে সাহায্য করে। একবার এসে ঘণ্টা দুয়েক ছিল, তার মধ্যে চারবার, অন্তত উল্লেখ করেছিল 'আপনাদের ছেলেপুলে হয়নি কেন? অ্যাঁ' রাহুল মুচকি হেসে প্রসঙ্গটার পাশ কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু বুড়োটা জোঁকের মত লেগেছিল।

'আমার বে-র প্রথম তিন বছরেই তিন ছেলে। আমার বড় ছেলের দু'বছরে দু'টি। বড় মেয়ের চার বছরে তিনটি। প্রথম দিকেই তো ছেলেপিলে হওয়া ভাল। তবে আপনারা শিক্ষিত, আজকাল আবার কত ওষুধ-বিষুদ বেরিয়েছে। কিন্তু বেশী বয়সে বাপ হলে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে তুলতেই দেখবেন বুড়ো হয়ে গেছেন, আর অল্প বয়সে হলে, বয়েস যখন পঞ্চাশ তখনই ছেলে রোজগার শুরু করে দেবে। ব্যস, বসে বসে তখন বুড়ো-বুড়িতে শুধু খাও আর ঘুমোও। এই দেখুন না ঊনসত্তর চলছে, দেখে বুঝতে পারবেন? কোন টেনশন নেই, ছেলেরাই সব দেখাশোনা করছে।'

সনৎ কুমারের মতে এই হল সংসার ধর্মের সার কথা। আর দু'ঘণ্টা ধরে এই আলোচনাটাই রীনার সঙ্গেই হয়েছিল। রাহুল খাটের এক কোণে কাত হয়ে শুয়ে বাসি খবরের কাগজটা তখন পড়ার ভান করছিল। পাঁচ বছর চাকরি করে রীনা কিভাবে এ্যাসিসটেন্ট হেডমিস্ট্রেস হল, রাহুল সেটা জানার দরকার বোধ করেনি বা জানতে ইচ্ছা হয়নি। শুধু এক আধবার মনে হয়েছিল যাদের ন্যায্য দাবি ডিঙিয়ে ও ওপরে উঠল, তারা মনে মনে ওর সম্পর্কে কি ভাবে। কিন্তু রীনার ভাবনা, সনৎ কুমার কিসে সন্তুষ্ট হয়। ফাউন্ডার প্রেসিডেন্টের প্রত্যেকটা কথাতেই সে সায় দিল। 'কত সামান্য থেকে আজ এইখানে উঠেছি'। সেই কাহিনী শুনতে শুনতে নানাভাবে বিস্মিত হয়ে বুড়োকে খুশি করল। সেই রাতেই রীনা পিল খেতে প্রথম অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। রাগে আপাদমস্তক জ্বালা করে উঠলেও রাহুল ওর ইচ্ছায় আপত্তি করেনি, তর্কও নয়। কিন্তু তিন মাস পরেও কোন ফল না ফলায়, সে ডাক্তারের কাছে হাজির হয়েছিল।

'কতক্ষণ লাগে একটা ঘর ঝাঁট দিতে? ভাত নামিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

রাহুল দরজার জোড়ে চোখ রাখল। রীনা স্নান করে এসেছে, ভিজে কাপড়গুলো হাতে। বারান্দায় নিজেই মেলবে। রতন তা হলে বাজার থেকে ফিরে ঝাঁট দিচ্ছিল। এবার রান্নাঘরে যাবে। রীনা জোড়ের ফাঁক থেকে সরে গেছে। বালিশগুলো থাবড়ে ফুলিয়ে রাখতে রাখতে রতন গোছগাছ করছে। রীনা ঘরে ঢোকামাত্র চুপ করল। এখন রীনা স্কুলে যাবার সাজ করবে। সাধারণত এই সময় আমি থাকি বাথরুমে, রাহুল জোড়ে চোখ রেখে ভাবল, তখন সায়া আর ব্রেশিয়ারটা বদলে নেয়। এটা কোনদিন দেখা হয়নি।

রতন বেরিয়ে যেতেই রীনা খাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ঠিক মুখোমুখি। জোড়ের ফাঁক দিয়ে রাহুল সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাচ্ছে তাকে। আট-ন ফুট দূরে মাত্র। স্থির দৃষ্টিতে এই দিকেই তাকিয়ে। রাহুল বুঝতে পারছে না এখন ও কি ভাবছে। উদ্বেগ, রাহুলের তাই মনে হচ্ছে, আবার মনে হচ্ছে ভয় কিংবা উত্তেজনা। দুই ভ্রুর মাঝে ফুলে উঠেছে চামড়া। নিঃশ্বাসটা গাঢ় হচ্ছে, দ্রুত হচ্ছে। কণ্ঠনালী ওঠানামা করল ঢোঁক গেলার আর ঠোঁট দুটি যেভাবে ফাঁক হয়ে রয়েছে তাতে মনে হয় ভেতরে প্রবল আলোড়ন ঘটছে। জানালা বন্ধ করতে সরে গেল রীনা। আবার এল। ঘরের দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে এগিয়ে আসতেই জোড়ের ফাঁক ঢেকে গেল। শিকল খোলার সময় লোহায় লোহায় ঘষার একটা শব্দ শুনল রাহুল। দরজার কাছ থেকে সে এক পা পিছিয়ে গেল। সন্তর্পণে পাল্লা দুটো খুলে রীনা দাঁড়িয়ে। কড়ি কাঠের কাছে ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসছে। ফলে ওর টিকালো নাক, কানের ডগা, বাম বাহু, চুলের কিয়দংশ বেশ স্পষ্টই দেখা যায়।

'তুমি বাথরুমে যাবে না।'

রীনা এমনভাবে বলল যেন রাহুল অন্য জগতের লোক। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন ওর দরকার হয় কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্টভাবে নিশ্চিত নয়।

'কেন যাব না?'

'কিভাবে যাবে?'

রাহুল চিন্তিত হল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা। ও পাশের বাড়ির তিনটে জানালা থেকে দেখা যায়। তবে বারান্দার পাঁচিলটা কোমর সমান উঁচু। হামা দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু রতন!

'ঠিক চলে যাব তুমি বরং রতনকে দোকানে পাঠাও।'

রীনা দরজা বন্ধ করে দিতেই রাহুলের প্রথমে মনে হল, তার স্বাধীনতার একটা বিরাট ভাগ থেকে এখন সে বঞ্চিত। নিজের দেহ বা তার প্রাকৃতিক যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে চিন্তামুক্ত থাকার স্বাধীনতা আর তার নেই। এখন থেকে বাথরুমে যাবার দরকার হলে তাকে রীনার মুখাপেক্ষী হতে হবে। ঘরের জানালা বন্ধ করে, রতনকে বাইরে পাঠিয়ে, ওপাশের বাড়ির জানালায় কেউ আছে কিনা দেখে রীনা তাকে সঙ্কেত জানালে তবে সে বাথরুমে যেতে পারবে। যদি রীনা না থাকে এবং তখন যদি বেরোবার দরকার হয়? রাহুল তা ভাবতে গিয়ে ধীরে ধীরে রেগে উঠতে শুরু করল। তার মনে হল আত্মরক্ষার জন্য এ কোন দশায় পৌঁছালাম।

দরজা খুলে রীনা চাপা স্বরে ডাকল। উঁকি দিয়ে রাহুল দেখল, বারান্দার তারে ভিজে কাপড়টা মেলে দিয়ে অনেক খানি ঢেকে দিয়েছে কিন্তু সবটা ঢাকেনি। ঘর থেকেই হামাগুড়ি দিয়ে সে বারান্দায় বেরোল। সেই সময় একবার মুখটা ঘুরিয়ে রীনার দিকে তাকিয়ে ছিল। চতুষ্পদ প্রাণীর দিকে প্রবল কৌতূহলে শিশুরা হয়ত এভাবে তাকায়। রাহুল সেই মুহূর্তে নিজেকে কুকুর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না। তাড়া খাওয়া দু'পায়ের ফাঁকে লেজ ঢোকান এবং করুণা প্রার্থী। নিজেকে ধিক্কার দিয়েই সে বাথরুমে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করার আগে শুনল রীনা বলছে, 'রতন কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই এসে যাবে।'

রাহুলের মনে হল, এই আটত্রিশ বছরের জীবনে কখনো কোন ইতর প্রাণীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করিনি। মেধা, বুদ্ধি, মহত্ত্ব, করুণা, ভালবাসা এমনকি ক্রোধ, আমার অধিগত বা জন্মগত কোন গুণাবলী দেখবার কোন সুযোগই এই চার দেয়ালের মধ্যে নেই। আমি এখন ইচ্ছা করলেই কথা বলতে পারি না একমাত্র নিজের সঙ্গে ছাড়া। না গান, না হাসি। খাওয়া, মল-মূত্রত্যাগ এবং ঘুম ছাড়া আর কিছু করার নেই। অবশ্য বইপড়া, লেখা বা ঠোঙা তৈরির মত কোন কাজ করতে পারি। কিন্তু এগুলো আমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে কোন সাহায্যই করবে না। আমি পালিয়েছি শুধুই বাঁচার তাগিদে আমার বিদ্যা বুদ্ধির নির্দেশ ছাড়াই ইতর প্রাণীর মত। যেভাবে একটা সৈনিক পরিখা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে মেশিন গানের প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই শত্রুর দিকে ধেয়ে যায় বীরত্ব দেখাতে নয়। এছাড়া তার বাঁচার আর অন্য উপায় নেই বলেই। সেই ভাবেই পালিয়েছিলাম। জৈব অস্তিত্ব রক্ষার সহজাত প্রেরণায় এবং অসাড় মস্তিষ্কে। একে এখানো অস্বীকার করতে পারি না, এজন্য আমি নিজেকে কাপুরষও ভাবতে পারছি না। কিন্তু কুকুরের কথা ভাবছি। এই প্রাণীটি হয়ত বা সাহসী। কর্তব্যনিষ্ঠ কিন্তু নিকৃষ্ট চরিত্র বোঝাবার জন্য একটা বিষেশণ। কুকুরের কয়েকটি বিশেষত্ব এখন আমাতে যে বর্তেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরিচিত কেউ এলে আমি চীৎকার করতে পারব না, আগে দরজা খুলে যেমন বলেছি আরে পরিমল, অনেকদিন পর ..... ভেতরে আয়– এখন আর বলা সম্ভব নয়।

কিংবা অপর একটা কুকুর দেখে তাকে কামড়াবার জন্য ছুটে যেতে পারব না যেমন গৌতমবাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে গরবাচভের গ্রাসনস্ত বা মারাদোনাই গ্রেটেস্ট, তাই নিয়ে তর্ক করতাম। কুকুরদের বিবাহিত স্ত্রী থাকে না, কিন্তু আমার আছে। ফলে সুবিধাটা এই যে, কোন কুকুরীর সহচর হওয়ার জন্য তার পাঁচটা কুকুরের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করতে হয় না।

রাহুলের মনে হল, শুধু এই ব্যাপারেই আমি কুকুর নই। রীনাকে শুইয়ে তার বুকের উপর উঠতে পারি (কখনো বাধা দেয়নি)। এই স্বাধীনতা টুকু এখনো দখলে আছে। শ্রম, বিশ্রাম, আনন্দ, সুখ এই সবের জন্য এই চার দেয়ালের মধ্যে এবার থেকে রীনার দেহখানা সম্বল করা ছাড়া আর তার কিছু নেই।

ভাবতে ভাবতে রাহুলের মনে পড়ল গত পাঁচ দিনে সে স্ত্রীলোক বিষয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেনি। কি করে বাঁচব, কি করলে ধরা পড়ব না, শুধু এই ভাবনাতেই সে আচ্ছন্ন ছিল। আর যেইমাত্র এই ঘরের নিরাপত্তাটা

পেল আর অমনি তার মন ব্যালান্স হারাতে শুরু করেছে। এটা হওয়া উচিৎ নয়। এখন সে বিপদের মধ্যগগনে। সামান্য অসাবধান হলে ধরা পড়ে যেতে পারে।

নিজেকে সংহত করতে, অনুভূতিগুলোকে প্রখর করতে গভীর কোন বিষয়ের ভাবনার মধ্যে ঢুকতে পারলে ভাল হয়। রাহুলের মনে হল, আদিম মানব আর আমার মধ্যে নৈকট্য কতটা– সে বিষয়ে তো ভেবে দেখা যেতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিকসে অনার্স পাওয়া ইউনাইটেড কেমিক্যালসের অ্যাসিসট্যান্ট রিলেশনস ম্যানেজার এবং পাঁচহাজার বছর আগের মানুষ কিংবা কুকুর এই শিরোনামে সন্দর্ভ রচনার কথা যদি ভাবা যায়, তাহলে কেমন হয়।

একটা চিনেমাটির প্লেটে চারখণ্ড টোস্ট আর এক গ্লাস চা, রীনা দরজার একটা পাল্লা খুলে মেঝেয় রেখেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল। রাহুল শিকল তুলে দেয়ার শব্দ শুনতে পেল। গোগ্রাসে টোস্টগুলে শেষ করে তারিয়ে তারিয়ে চা টুকু খেল। দেখে নিয়েছিল আজকের খবরের কাগজটা খাটের উপর। দেখে একবার ইচ্ছে হয়েছিল জানতে কলকাতার কোথাও নারীধর্ষণ হয়েছে কিনা আর ভিভ রিচার্ডস ছিয়াশি নট-আউট ছিল, শেষ পর্যন্ত কত করল। জন্মাষ্টমী আজ। রীনার স্কুল নিশ্চয় বন্ধ। সারাক্ষণ বাড়িতে থাকলে ভালই। কোন কিছুর দরকার হলেই ডেকে বলা যাবে। কিন্তু কিভাবে ডাকব? রাহুল বিভ্রান্ত বোধ করল। এত তুচ্ছ অথচ বিপজ্জনক একটা সমস্যার আবির্ভাব ঘটতে পারে তা ধারণা করতে পারেনি। গলা থেকে কোন স্বর বার করা যাবে না। কুকুর অন্তত কুঁই কুঁইও করতে পারে। দরজায় টোকা দেয়া যায়, কিন্তু রতন যদি ঘরে থাকে আর শুনতে পায়।

রাহুল ভেবে দেখল প্রথমেই এই সমস্যাটা মেটান দরকার। তার কাছে এখন সব থেকে জরুরি বিষয় রীনাকে ডেকে প্রয়োজন জানাবার উপায় আবিষ্কার করা। কিন্তু শূন্য চিনেমাটির প্লেট আর গ্লাসটা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। প্রডাকসান ম্যানেজার কৃষ্ণমূর্তির বাড়ির বারান্দায় এই রকম প্লেট। অবশ্য কলাইয়ের, সে দেখেছে। আলসেসিশয়ানটা সেখানেই বাঁধা। প্লেটটা তার পাশে থাকে আর একটা বাটিতে জল। রাহুলের মনে হল, জল তেষ্টা পেলে সে কি করবে। ঘরের কুঁজোটা এনে রাখা ছাড়া উপায় নেই। রোজ তাতে জল ভরার কাজটা রীনাকেই করতে হবে।

ঘরের বাইরে রীনার ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যাচ্ছে। জোড়ের ফাঁকে চোখ রেখে সে দেখতে পেল না। নখ দিয়ে দরজা আঁচড়াতে থাকল যদি শুনতে পায়। রীনা ঘরে ঢুকল, পেছনে রতন। রাহুল আঁচড়কাটা বন্ধ করল।

‘পই পই করে বলেছিলুম গোলমাল হতে পারে, কাপড়গুলো এনে রাখ, এনে রাখ। এখন আমি এই ময়লা শাড়ি পরে থাকব? একটা বুড়ো ভূত কোথাকার। কথা বললে শোন না কেন? অন্যান্য কোন বাড়িতে এমন কর্তামি করলে দূর করে দিতে।’

রতনের জবাব শোনা গেল না। এখন ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না, সেটা ভালই। যন্ত্রণাকাতর বৃদ্ধ মুখ দেখা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ‘দাঁড়িয়ে থেকে আর কাজ বাড়িও না, ওদিকে ভাতের তলা ধরে গেল হয়তো! তবে এই বলে রাখছি এবার যদি কথা মত কাজ না কর, তাহলে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নিতে হবে।’

রাহুল চিন্তায় পড়ল। রতন কোথাও যাবে না। বা ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কিন্তু বলা যায় না, সে সব ভাইপোর কথা প্রায়ই বলত। হাতে করে মানুষ করেছি, এখন ভালো রোজগার করে, যারা প্রায়ই নাকি বলে, কাকা আমাদের কাছে এসে থাক, দরকার কি বুড়ো বয়সে কষ্ট করে’– তাদের কেউ এসে যদি রতনকে নিয়ে যায় তা হলে নতুন এটা লোক রাখতেই হবে। নিশ্চয় কোন মেয়ে মানুষ এবং রীনার অনুপস্থিতিতে কৌতূহলবশতই হয়তো একদিন, এ ঘরটা বন্ধ থাকার কারণ জানতে শিকল খুলে উঁকি দিতে পারে।

ব্যাপারটা রীনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। রতনের সঙ্গে কোন রকম খারাপ ব্যবহার করা তার চলবে না। ওর অনাবশ্যক কোন কৌতূহল নেই। অন্তত এ ঘরটা সম্পর্কে নেই। নিজের মত করে কাজগুলো করতে দিলেই ও খুশি থাকে। তাই দেয়া হোক। রীনা যেন কর্তৃত্ব ফলাবার চেষ্টা না করে– এখন এই সংসারে বা এই ফ্ল্যাটে

কোন রকমের পরিবর্তন ঘটানো চলবে না, পুলিশ নিশ্চয় এখনো ওয়াচ রাখছে।

রতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। রীনা ঘরেই আছে তবে দেখা যাচ্ছে না। রাহুল দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। এখন তার কিছু করার নেই। জানালার খোলা পাল্লাটা দিয়ে আলো আসছে বটে, কিন্তু হাওয়া নেই। ওটা বন্ধ করলে আলো এবং হাওয়াহীন এই ঘরে কয়েক ঘণ্টার বেশি বাঁচা যাবে না। সুতরাং ঝুঁকি নিয়ে পাল্লাটা খুলে রাখতেই হবে উপায় নেই। যারা মুক্ত সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও তো ঝুঁকি নিতে হয়। যেমন রীনা। একটা খুনীকে লুকিয়ে রাখার রিস্ক, হোক না স্বামী । নিয়েছে তো, পুলিশ ঠিক কি কি প্রশ্ন করেছিল সেটা জেনে নিতে হবে। এখন পর্যন্ত নার্ভ শান্ত রেখেছে। হাউ মাউ করে কান্না জোড়েনি বা প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করেনি। আচরণে, কথায় অচঞ্চল শান্ত ভাবটা বজায় রাখা সহজ ব্যাপার নয়। তার শ্রদ্ধা জাগল রীনার প্রতি।

কিন্তু ভ্যাপসা গরমটা ক্রমশই অসহনীয় লাগছে। ও ঘরে পাখা ঘুরছে। পুরোনা কিছু খবরের কাগজ একধারে ছড়ানো। তারই একটা ভাঁজ করে নিজেকে সে হাওয়া দিতে শুরু করল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই বিরক্ত লাগায় কাগজটা ছুঁড়ে ফেলল। এতে গরমবোধ যেন আরও বাড়ল। বাইরে হাওয়া আছে কিনা লক্ষ্য করার জন্য জানালা দিয়ে তাকাল। ছাদের পাঁচিলে মেলে দেয়া একটা শাড়ির প্রান্ত ঝুলছে ঠিক জানালা বরাবর। হাওয়া নেই তাই দুলছে না।

সে ভাবতে চেষ্টা করল শাড়িটা কার? অনুর না তার দিদি তনুর? এই শাড়িটা পরেই যতদূর মনে পড়ে অনু কয়েকবার তাদের ফ্ল্যাটে এসেছে। আবার তনুকেও এটা পরে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তনু কয়েকবার এসেছে, অতি লাজুক, রান্নাঘর আর ছাদের বাইরে গেলে দিশেহারা হয়। ঠিক বিপরীত প্রকৃতির অনু। দিনে বার দুয়েক তো এই ফ্ল্যাটে সকালে বা সন্ধ্যায় আসবেই।

রাহুলরা প্রথম যখন এখানে এল অনু তখনই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। এক ছুটির দুপুরেও রীনাকে শুনিয়েছিল সীতাংশুকে তার কতখানি ভাল লাগে আর সীতাংশুও প্রতি চিঠিতে সেই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা চিঠি সে রীনাকে পড়িয়েও ছিল।

‘এইটুক মেয়ের সঙ্গে এই সব নিয়ে কথা বলো কেন’?

রাহুল ভর্ৎসনা করেছিল।

‘ওইটুকু মেয়ে....সীতাংশু ওকে কতো পর্নো লিটারেচার পড়িয়েছে জান।’

‘জেনে দরকার নেই... সীতাংশুটা কে?’

‘মোড়ের ব্যানার্জি মেডিকোর ছেলে। দাদার স্কুটারে চেপে মাঝে মাঝে এখান দিয়ে যায়। পয়সা আছে। অনুর দুঃখ, সোনার বেণে না হয়ে যদি সে বামুণের ঘরে জন্মাত। একদিন জিজ্ঞেস করল, বৌদি আপনাদের বিয়েতে জাত নিয়ে আপত্তি ওঠেনি? আর একবার জানতে চেয়েছিল, যদি আপত্তি উঠত তাহলে কি করতেন?’

রাহুলের মনে পড়ল একটা দৃশ্য। মাস তিনেক আগে দেখা। লুকিয়ে সীতাংশুর সঙ্গে ছবি তোলাতে যাবে বলে অনু রবিবার বিকেলে এসেছিল রীনার একটা ছাপা পালিয়েস্টার শাড়ি পরতে আর চুল বাঁধতে। সেই সময় রাহুল অফিসের এক ক্লায়েন্টকে লাঞ্চ খাইয়ে, আড্ডা দিয়ে ফেরে। ওর আসাটা অনু টের পায়নি। ঘরে ঢুকতে গিয়ে রাহুলকে থমকে পড়তে হয়, অনু দু’হাত তুলে শ্লিভলেস ব্লাউজের পিঠের হুক লাগাছে, পরনে সায়া। তাকে দেখেই কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে, পিছন ফিরে অনু ড্রেসিং টেবলের ওপর ফুঁকরে ঝুঁকে পড়ল, রাহুল দ্রুত সরে যায়। রীনা তখন রান্নাঘরে পুডিং তৈরিতে ব্যস্ত।

দৃশ্যটা কুঁজো হওয়া একটা সতেরো আঠারো বছরের ডাঁটো দেহ, ব্লাউজ আর সায়ার মাঝে কোমর বেড় দিয়ে বাদামি রেশমের মত মসৃণ কোমল ত্বক, নিতম্বের ওপর আধোময়লা সাদা সায়ার মাঝ দিয়ে একটা ভাঁজ সে বহুদিনই মনে মনে চোখের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খ ফুটিয়ে তুলেছে। যতই দিন গেছে বরং সে যেন আরও কিছু যুক্ত করেছে নিজের অজান্তেই।

প্রায়শই সে দেখে, অনু পিছন ফিরে ঝুঁকে পড়ছে না, শুধু চোখের পাতা নামিয়ে থরথর কাঁপছে বা যখন সে হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়াল তখনো ব্লাউজটা অনুর গায়ে দেয়াই হয়নি। সে আরও আবিষ্কার করেছিল, এই রকম ভাবনায় রীনা তখন আর রান্না ঘরে নয়। স্কুলের কাজে আটকে পড়ে বাড়ি ফিরতে দেরি করছে। পরে রাহুল এই ধরনের দৃশ্য রচনার জন্য একটা কারণ খুঁজে পায়। সে ভেবেছিল, অনু নিশ্চয় রীনাকে তার অপ্রতিভ হওয়ার খবরটা জানাবে আর রীনা তাকে সেটা বলবে সস্নিগ্ধ গলায়। কিন্তু রীনা তাকে কিছুই বলেনি অর্থাৎ অনু এটা চেপে গেছে।

এ সব কল্পনা রুচিবিগর্হিত, অন্তত আমার পক্ষে শোভা পায় না। এইভাবে রাহুল বহুবার নিজেকে ধমকেছে, ভয়ও দেখিয়েছে। বিকৃত চিন্তা করতে করতে কখন কি করে ফেলবে আর মান-ইজ্জত নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তবুও সে লক্ষ্য করেছে, অবৈধ, অশ্লীল ছবি ফোটাবার মানসিক যন্ত্রটি তার আয়ত্তাধীন নয়। এই অক্ষমতা তাকে বারবার নিজের উপর রাগিয়ে তুলেছে।

কে যেন শাড়িটা তুলে নিল। কে তুলল দেখার জন্য রাহুল বুক চেপে জানালার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে পড়ল। পুরুষের গলা শোনা যাচ্ছে ভিতর থেকে। দরজায় চোখ রাখল। ঘরে কেউ নেই। রীনা দালানে কথা বলছে কার সঙ্গে? পুলিশ? রাহুল মুহূর্তে বিদ্যুৎপৃষ্ট মৃতদেহের মত কঠিন হয়ে গেল। মাত্র শ্রবণ ক্ষমতার দ্বারা এখন সে জীবিত। পুরুষ কণ্ঠটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ধীরলয়ে কর্তব্য সম্পাদনের পেশাদারী ভঙ্গীতে নয়, লঘু কখনো বা দ্রুত কণ্ঠে পূর্ণমাত্রায় বন্ধুত্বের প্রকাশ।

রাহুল ধীরে ধীরে এবার শিথিল হতে শুরু করল। এখন সে দেখছে ঘরের মধ্যে ধূম্রবর্ণ আলো, অনুভব করছে দেহের ধাবমান রক্ত স্বেদবিন্দুতে পিছল গাত্রত্বক এবং মুখের মধ্যে অল্প স্বাদ। কার কণ্ঠস্বর, এ তথ্য জানার কৌতূহল তার হচ্ছে না। একবার শুধু সে ভাবল, মিথ্যেই ভয় পেয়েছিলাম।

পাশের ঘরেই এবার কথা হচ্ছে। রাহুল দেখতে পেল না রীনাকে, তার বদলে একটি যুবককে দেখল যাকে সে আগে এই পাড়াতেই দেখেছে বলে মনে হল। থুতনি কর্কণ, গালে দু' একটি মরা ব্রনর গর্ত। ছিপছিপে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, লঘু ছেলেমানুষি ওর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। ভাল দর্জির হাতে তৈরি ট্রাউজার্স। এই কি তবে অনুর সীতাংশু? তা ছাড়া আর কে হতে পারে। কিংবা রীনার বাপের বাড়ির কেউ?

'আমি তো দাঁড়িয়েছিলুম দোকানের সামনে'– ছেলেটি উত্তেজিত গলায় বলল। দূর থেকে পুলিশের গাড়িটা আসছে, সার্চলাইটের আলো। 'আমাদের গলি থেকেই তো বোমাটা ছুঁড়ল।' 'ওভাবে তখন দাঁড়িয়ে থকে'? রীনার আদুরে ধমক রাহুল শুনল।

'দাঁড়াবো না তো কি করব। সব বাড়ির ছাদে, বারান্দায় লোক। তাছাড়া রাস্তার সব আলো নেভানো, সব বাড়িরও। সে যে কি অন্ধকার কি বলব, একটা হাতিও যদি তখন হেঁটে যায় তো কেউ দেখতে পেত না। আর পুলিশের গাড়িগুলো বুনো শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করে ছুঁটে যাচ্ছে আর আসছে। বোমাটা পড়তেই দাদা শব্দ শুনে আমার হাত ধরে এমন টানল যে বেটাল হয়ে পড়ে গেলুম আর সেই মুহূর্তে গুলিটা এসে দেয়ালে লাগল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম তার এক ইঞ্চি কি দু' ইঞ্চি দূরে।

'ইসস' রীনা শিউরে উঠল শব্দ করে, 'কি ছেলে বল তো! যদি দাঁড়িয়ে থাকতে তাহলে কি হতো?'

ছেলেটি তাচ্ছিল্য দেখাতে ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়াল।

রাহুল আন্দাজ করল রীনা এখন ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে। কি করছে ওখানে! চিরুনি, টিপ, পাউডার? এই সবের কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত? ছেলেটি খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ কিছুক্ষণ থাকবে।

'তোমায় যে চা করে দেব তারও উপায় নেই। চিনি একদম ফুরিয়েছে।'

'রেশন আনান নি? দোকান তো খোলা দেখলুম।'

'তাই নাকি।'

রীনাকে দেখা গেল, সবটা নয়, ডান হাঁটু, ডান বাহু ইত্যাদি। ছেলেটির থেকে দু'হাত ব্যবধান। রতনকে ডেকে রেশন কার্ড আর টাকা দিয়ে দোকানে পাঠাল।

ঘামে সপ্ সপ্ করছে জাঙ্গিয়া। আজ ছ'দিন থেকে সে এটা পরে আছে। দেয়ালে পিঠ দিতেই ঘামটা শুষে নিল চুনবালি। দু'হাত তুলে মুখোমুখি হয়ে সারা শরীর দিয়ে দেঁয়ালটাকে আঁকড়ে ধরল। জামাটা ছাড়া আর কিছুই শরীর থেকে খোলা হয়নি। এখনি চান করে পরিষ্কার পা-জামা পরতে হবে। ও ঘরে কি কথা হচ্ছ শোনার আগ্রহ তার নেই। বাতাসহীন, প্রায়ান্ধকার ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা এই ছোট্ট ঘরটা তাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলছে। কানের পিছন, ঘাড় কণ্ঠা দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। উলঙ্গ হয়ে রাহুল মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে থাকল।

আর কথা হচ্ছে না। রহুল উঠে দরজায় জোড়ে চোখ রাখল। ঘরে কেউ নেই। ছেলেটা বোধ হয় চলে গেছে। রতনের ফিরতে অন্তত এক ঘণ্টা। নখ দিয়ে সে দরজা আঁচড়াতে শুরু করল।

রীনা আসছে না। টোকা দিল তবুও আসছে না, জোরে ধাক্কা দিল কয়েকবার। হঠাৎ একটা সবুজ রঙ এগিয়ে এসে কাল হয়ে চোখের সামনে দাঁড়ালো। রাহুল পিছিয়ে এল। দরজাটা খুলেই রীনা অস্ফুট শব্দ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাহুল দ্রুত ট্রাউজার্সটা পরতে পরতে বলল– 'চান করব। ভীষণ গরম। আমি আর পারছি না।...আমি চান করব।'

'রতন এসে পড়ে যদি।'

রাহুল শুনতে পেল না কথাটা, হামা দিয়ে ততক্ষণে বাথরুমের দিকে যেতে শুরু করেছে। রীনা তার পিছনে পিছনে এল। বাথরুমে ঢুকেই রাহুল বলল, 'আমার পা-জামাটা দাও, শিঘ্রি।'

রীনা দ্রুত ঘরে এল। এখন সময় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রতনই নয়। অন্য কেউই এখন এসে পড়তে পারে লন্ড্রিতে কাচা পা-জামাটা রীনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাহুল বাথরুমের দরজা বন্ধ করল। ছোট মগে বারবার জল ঢালার ধৈর্য তার এখন নেই। ট্রাউজার্স সমেত সে চৌবাচ্চা নেমে পড়ল। মিনিট পাঁচেক পর দরজায় টোকা পরতে রাহুল চৌবাচ্চা থেকে উঠল।

'কে?'

'আমি তাড়াতাড়ি নাও।'

'হ্যাঁ নিচ্ছি।'

'প্যান্টটা কি করবে?'

রাহুল প্রথমে বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে খেয়াল হল ভিজে ট্রাউজার্সটা প্রকাশ্যে শুকতে দিলে রতনের কৌতূহলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য ছোট ঘরটায় গিয়ে তোরঙ্গাটার উপর মেলে দিলে কোন সমস্যা দেখা দেবে না। রাহুল এই প্রথম একটা জটিল অসুবিধার পাশ কাটাতে পেরে হাল্কা বোধ করল।

বাথরুমের ব্রাকেটে সাবান, মাজন এবং দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলোয় তার চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে ভাবল এগুলো ছাড়াই সে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ফেলল কি করে। গালে তালু ঘষল। কিন্তু এখন নিজেকে পরিষ্কার করার মত সময় তার হাতে নেই।

রীনা আবার দরজায় টোকা দিল। রাহুল চৌবাচ্চার খোলা জলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হয়ে গেছে। যাচ্ছি।'

ফিরে আসার সময় তার মনে হল, চার-হাত পায়ে চলাটা তো বেশ সহজই। যেন দু'পায়ে হাঁটছি। এটায় যেন শৈশবে ফিরে যাওয়ার মজা রয়েছে। আর একটু বাড়িয়ে ভাবলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ হওয়ার অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। দাঁত মাজা নেই, দাড়ি কামানো নেই। চুল আঁচ্ড়ানো নেই... আছে অতর্কিত ভয়ের আক্রমণ।

বিষণ্ন করুণ চোখে রীনা তাকিয়ে দেখছে। ভিজে ট্রাউজার্সটা কাঁধে রেখে হামা দিয়ে যেতে যেতে রাহুল ঘাড় তুলে তাকাল। জীবনটাকে নিছকই মুক্ত রাখার জন্য চার-পেয়ে হওয়া, এতে দুঃখ পাবার কি আছে। হাসল, শোবার ঘরে পাখা ঘুরছে। রাহুল হাওয়ার নিচে বসল।

'রতন ফেরার আগেই আমাকে চাট্টি ভাত দিও।'

'এখনো তো কিছু রান্নাই হয়নি।'

'এই ছেলেটিই কি অনুর সীতাংশু?'

'হ্যাঁ।'

'এসেছিল কেন?'

'যদি অনুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অনুও তো সকালে একবার ঘুরে গেছে।'

'শোবার ঘরে ঢোকেনি বলে তুমি জানতে পারনি।'

'তুমি কি বেরোবে এখন?'

'হ্যাঁ স্কুলে যাব।' 'আজ জন্মাষ্টমী.....।'

'বন্ধ থাকলেও গার্জিয়ান কমিটির সঙ্গে বসতে হবে। ওদের কিছু কমপ্লেন আর সাজেশানস।'

"কিন্তু আমার সঙ্গে যে তোমার একবার বসা দরকার।' কেন, কি জন্য, কিভাবে...তোমার কি জানতে ইচ্ছে করছ না? পুলিশের কাছ থেকে, খবরের কাগজ থেকে। লোকজনের মুখ থেকে নিশ্চয় অনেক কিছু শুনেছ। কিন্তু আসল লোকটির কাছ থেকে কি"

"যা শুনেছি সেটাই যথেষ্ট।..... আমি ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। আর কিছু শোনার নেই।"

রহুল লক্ষ্য করল রীনার চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ও এখন তার কথা বিশ্বাস করবে না। ধরেই যেন রেখেছে। রাহুল বানিয়ে একটা গল্প ফাঁদবে।

'ঘরটা পরিষ্কার করা দরকার আর কুঁজোটা।'

'রতন রোজ জল ভরে কুঁজোটা দেখতে না পেলে জিজ্ঞাসা করবে।'

'বলবে ভেঙে গেল, ফেলে দিয়েছি।....আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা ভাবতে হবে। বাথরুমে যাওয়ার দরকার হলে... রাহুল তাকিয়ে রইল রীনার মুখের দিকে।

'আজ স্কুলে না গেলেই নয়।'

'হ্যাঁ, যেতেই হবে।'

রাহুলের এখন বলতে ইচ্ছে করছে, তার থেকেও জরুরি আমার জন্য তোমার আজ এখান থাকা। বদলে তার মুখ থেকে আবেদনের মত বেরিয়ে এল, 'নাই বা গেলে। কি এমন গুরুতর কথা-।'

রীনার মুখে বিরক্তি জমে উঠেছে দেখে সে থেমে গেল।

'তোমার ঘরটা পরিষ্কার করে দি।' রীনা ঝাঁটা আনতে ঘরের বাইরে গেল।

তোমার ঘর। রাহুল ভাবল, তা হলে তার একটা আলাদা অস্তিত্ব তৈরি হল। দুজনের মধ্যে ব্যবধান মনে মনে হয়তো এসে গেছে। সে ডাবল বেড খাটের দিকে তাকাল। মাথার বালিশ দুটো আর পাশাপাশি নেই। এখন একটার ওপর আর একটা। রীনা আলমারি থেকে বেডকভার বার করে তাকে দিয়েছে। বিছানায় পাতা প্লেইন

সবুজটা দেয়নি। দেখতে না পেয়ে যদি রতন জিজ্ঞাসা করে বালিশ বেডকভার গেল কোথায়? রীনার ঝাঁট দেয়া এক মিনিটেই শেষ। মেঝের জায়গা কোথায় যে ঝাঁটা বুলোবে। সে বালতিতে জল আর ন্যাতা নিয়ে এল। দু'তিন বার মুছল।

'ঘরের প্রায় জিনিসগুলো ফেলে দেয়া দরকার? কোনটাই কাজে লাগে না অথচ রেখে দেয়া হয়েছে।' রাহুল বিরক্ত স্বরে বলল।

'এসব তুমিই রেখেছ। তোরঙ্গটা কি দরকার ছিল রাখার। তুমিই বললে পুরনো বই, ম্যাগাজিন ওর মধ্যে রেখে দাও কিন্তু ওই বই ম্যাগাজিনগুলোই বা রাখার কি দরকার? কেউ তো একবারও উল্টেও দেখল না এতদিনে। এসবই উঁচু মানসিকতা। 'রীনার গলার স্বর উচ্চগ্রামে উঠেছে। সভয়ে রাহুল হাতটা বাতাসে থাবড়ে থাবড়ে তাকে গলা নামাতে ইশারা করল।

জানালার পর্দা ঝুলছে। অন্য বাড়ি থেকে দেখা যাবে না ঘরের মধ্যটা। ট্রানজিসটার টা কোথায়? টিভি কেনার পর রেডিও আর শোনাই হয় না। ব্যাটারিও নিশ্চয় নিঃশেষ। তারা দুজন কথা বলার সময় ট্র্যানজিস্টার টা চালিয়ে দিলে একটা ভয় থেকে রেহাই মিলবে।

'আজই ট্রানজিস্টারের ব্যাটারি আনিও, আর ধূপ।'

'ধূপ কি জন্য?'

'ঘরে বিশ্রি ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ধূপ জ্বালালে তবু কিছুটা কমবে।'

'ধূপের গন্ধ আর ধোঁয়া দরজার ফাঁক দিয়ে যখন এ ঘরে আসবে আর রতন ধরে নেবে নিশ্চয় আগুন-টাগুন লেগেছে আর তাই ভেবে তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে যখন ঢুকবে তখন তো ভূত দেখার মত চীৎকার শুরু করবে।'

রাহুল অপ্রতিভ হয়ে প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্য বলল, 'ন্যাপথলিন কিনে এনো, গন্ধ হবে আর পোকা-মাকড়ও পালাবে?'

'তুমি কি ওই ঘরে পাকাপোক্তভাবে বাস করার কথা ভাবছ নাকি'। রীনা জিজ্ঞাসা করল না, শুধু সারাজীবনে যত বিস্ময় সে সঞ্চয় করেছে সেগুলো এক সঙ্গে প্রকাশ করল তার গলা দিয়ে।

রাহুল জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল। কারণ সে নিজেও এখন পর্যন্ত জানে না, সে কি করবে, শুধু জানে, তাকে বাঁচতে হবে। 'এভাবে কতদিন লুকিয়ে থাকবে?'

'যতদিন সম্ভব....যতদিন'

সদর দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। কথা অসমাপ্ত রেখে। রাহুল ছিটকে তার কুঠুরিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। ভিতর থেকে খিল বা ছিটকিনি নেই। সে দরজায় পা ছড়িয়ে বসল।

তিন

খবরের কাগজে যা কিছু বেরিয়েছে রাহুল তা পড়েছে। মেয়েটির বাড়ি রানাঘাটে। রোজই কোলকতায় আসত 'দেহ বিক্রয় করে' রোজগারের জন্য। বয়স পঁচিশ। নাম ছবি। তাকে নিয়ে রাত আটটা নাগাদ জনা চারেক লোককে অন্ধকার মাঠের দিকে হেঁটে যেতে দেখা গেছিল বলে এক স্থানীয় চা ওয়ালা জানায়। ওই মাঠে লোকগুলো ছবিকে পরপর ধর্ষণ করার পর তাকে গলা টিপে মারে। ছবির দেহে অলঙ্কার বা তার হাত ব্যাগে টাকা পাওয়া যায়নি। মনে হয় গহনা বা টাকার জন্য তাকে খুন করা হয়েছে।

ধর্ষণকারীদের মধ্যে একজনকেও মৃত অবস্থায় কাছেই পাওয়া যায়। তার মাথা ফেটে দু ফাঁক হয়েছিল।

তাকে বাঁশ দিয়ে মাথায় মেরে খুন করা হয়। পুলিশের অনুমান এই খুন গহনা বা টাকার ভাগ নিয়ে বিবাদেরই

ফল। নিহত ব্যক্তির নাম শ্যামল। সে ঘটনাস্থলের আধমাইল দূরের বাসিন্দা। তার নামে কয়েকটি ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা আছে। আততায়ীরা কেউ ধরা পড়েনি। তবে পুলিশ জোর তল্লাশ চালাচ্ছে। তাদের ধরার মত সূত্র পুলিশ পেয়েছে।

রাহুলকে ভাবিয়েছে ও ধরার মত সূত্র কথাটা সে কিছু কি ফেলে এসেছে মাঠে? কলম, রুমাল, ঘড়ি, জুতো, মানিব্যাগ, কাপড়ের টুকরো, মাথার চুল?....হাতের ছাপ পায়ের ছাপ? হ্যাঁ বাঁশের খোঁটাটায় হাতের ছাপ থাকতে পারে। কিন্তু তার পরই তো জোরে বৃষ্টি নেমেছিল। হাতের বা পায়ের ছাপটাপ কি আর তাতে ধুয়ে যায়নি? তা ছাড়া কিছুই তো সে ফেলে আসেনি?

চা-ওয়ালাটা কি শুনেছে, কি দেখেছে? ওই লোকটাই সূত্র হতে পারে। রাহুল বুঝতে পারছে না, লোকটা তাকে চেনে কিনা। অনেক লোকই শর্টকাটের জন্য মাঠের পথ ধরে। চা-ওয়ালা সবাইকে কি চিনে রেখেছে? সেও তো ভাল করে মুখটা কখনো দেখেনি, কখনো ওর দোকানে চাও খায়নি। ওর কাছ থেকে পুলিশ কি জানতে পারবে?

আরও দুটো লোক ছিল যারা ছুটে পালায়। তাদের কেউ ধরা পড়েনি। শ্যামলের মত লোকের সঙ্গী যখন নিশ্চয় ওরাও ডাকাতি-ছিনতাই করে। ওরা দু'জন ছবিকে খুন করেনি, কেননা 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে ছবির চীৎকার করার সময় ওরা দূরে ছিল। ছবির কাছে ছিল শ্যামল, সেই গলা টিপেছে। অন্য দু'জন তখন ছুটে পালাবার সময় জানতও না শ্যামল ছবিকে খুন করছে এবং সে নিজেও দ্বিতীয় এক আততায়ীর হাতে খুন হতে চলেছে। লোক দুটো তাকে দেখেছে। হয়ত শ্যামলের মত ওরাও আধ মাইলের মধ্যেই বাস করে। ওরা তাকে দেখলে চিনতে পারবে কিনা সে বিষয়ে রাহুলের সন্দেহ আছে। আলো যথেষ্টই কম ছিল। কিন্তু শ্যামলের খুনী যে তারা দু'জন নয়, এই কথাটা বলার জন্য ওরা কি পুলিশের কাছে যাবে?

মোটেই নয়। এরা হার্ডকোর ক্রিমিনাল। একটা সেকস বেচুনী মফস্বলের গরীব মেয়েকে ঠকাবে এবং লুটও করবে স্থির করেই তাকে ওরা এনেছিল। মেয়েটা চেঁচাতে এবং তার এসে পড়াতেই গলাটা টিপে দিয়েছে। সে এসে পড়েছিল বলেই রাহুলের বিশ্বাস, ছবি মরল। না হলে .... তাহলেও বোধ হয় মরত। এদেরই হাতে কিংবা এইডসে কিংবা এতকমে মরা যায় যে রাহুল এই নিয়ে আর ভাবতে চায় না। তবে ছবির টাকা-গহনার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এটা মনে পড়তে রাহুলের হো হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হয়। সোনা দানা গায়ে দিয়ে রানাঘাট থেকে কেউ কি এই ব্যবসা করতে আসে? আর 'বিবাদ' যে হয়েছে এটা পুলিশ বুঝল কি করে? সোজা ব্যাপারটাকে জটিল করে না তুলতে পারলে বোধহয়, বুদ্ধির পরিচয় দেয়া যায় না।

কিন্তু সূত্র ধরে পুলিশ এই ফ্ল্যাটে এসেছিল, রীনার সঙ্গে কথা বলে গেছে। ওরা জানল কি করে? কি কথাবার্তা হয়েছে রীনা তা বলতে চায়নি। স্কুল থেকে ফিরলে ওকে চেপে ধরতে হবে। কথা বলার সুযোগ রতন জেগে থাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। রতন না থাকলে, এই কুঠুরিতে অন্ধকারে বসে তাকে ভেপসে মরতে হত না। এখন তাহলে সে শোবার ঘরে পাখার হাওয়ার নিচে হাত-পা ছড়িয়ে খাটে শুয়ে থাকতে পারত।

রতনটাকে কি বিদায় করা যায় না?

চিন্তাটা আসা মাত্র সে কুঁকড়ে গেল। এতকাল ধরে যে করুণা, মায়া সে এই বৃদ্ধটি সম্পর্কে পোষণ করে এসেছে সেটা কখন যেন নিজের স্বার্থের, দৈহিক নিরাপত্তার প্রশ্নে উবে গেছে। রাহুল অপ্রতিভ বোধ করল নিজের কাছেই। মহৎ, সৎ অনুভবগুলো দেখছি এই একটা জিনিসের কাছে জব্দ– নিজের প্রাণ নিয়ে যখন প্রশ্নটা ওঠে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই এটা রক্ষা করার তালিকায় এক নম্বরে।

রীনা স্কুল থেকে ফিরল ক'টার সময় রাহুল সেটা তার হাতঘড়ি দেখে বুঝতে পারল না। দম না দেয়ায় ঘড়ি বন্ধ। তবে সামনের বাড়ির ঝিয়ের গলা থেকে আন্দাজ করল চারটে বেজে গেছে। স্কুলের মিটিং ছিল এগারোটায়। এতক্ষণ ধরে কি গার্জেনরা বসে থেকেছে।

রাহুল কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। বসবাসের জন্য ঘরের এটাই নতুন উপকরণ। একটা চিনেমাটির প্লেট

অবশ্য রয়েছে কিন্তু ওটা বার করে দিতে হবে। রীনা ভাত খেতে বসে রতনকে বাথরুমে পাঠিয়েছিল, সাবান জলে ভিজিয়ে রাখা বালিসের ওয়াড়গুলো কাচতে। ডাইনিং স্পেস অর্থাৎ দালান থেকে শোবার ঘরের দরজায় ভাতের প্লেট, তাতে ডাল-তরকারি-মাছ ঢেলে একটা অদ্ভুত খাদ্য বানিয়ে, রীনার পৌঁছতে পনেরো সেকেন্ডও লাগেনি।

শিকল খুলে দরজার পাল্লা ফাঁক করে, প্লেটটা মেঝেয়ে ঠেলে দিয়েছিল। কোন কথা না বলে দ্রুত দরজা বন্ধ করে শিকলটা আবার তুলে দেয়। রাহুল খুব তৃপ্তি ভরে প্লেটটা শেষ করেছিল। ঘোঁট পাকানো খাদ্য খেতে তার কোন অসুবিধা হয়নি।

রীনা খাটে বালিশে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে। স্কুলের শাড়িটা বদলায়নি। এক দৃষ্টে সে ছোট ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে। রতন বাইরে থেকে কি জিজ্ঞাসা করল, রীনা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'টেবিলেই থাক, দরকারি জিনিস। তুমি হাত দিও না।' তারপর কি ভেবে উঠে ঘরের বাইরে গেল আর ফিরে এল খবরের কাগজে মোড়া দড়িবাঁধা একটা প্যাকেট হাতে। সেটা ছোট টেবিলের ওপর রেখে লেখার প্যাড আর কলম নিয়ে খাটে উপুড় হয়ে লিখতে শুরু করল।

জোড়ের ফাঁক দিয়ে রাহুলের মনে হল সে যেন থিয়েটার দেখছে। রীনা জানে সে এই ঘরে যা কিছু করুক বা বলুক, সব সময়ই তার একজন দর্শক আছে। হোক না স্বামী, আড়াল থেকে কেউ সদা সর্বদা লক্ষ্য করতে থাকলে সেও আড়ষ্ট হয়ে যাবে। এক ধরনের নজরবন্দী দশার মধ্যে থাকতে থাকতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। রাহুল সেটা অনুভব করতে পারলেও নিরুপায়।

একটা চিঠি লিখল রীনা। কাগজটা ভাঁজ করে সে ঘরের বাইরে গেল। রতনের সঙ্গে কথা বলছে। কি চিঠি? কাকে চিঠি?

'চা আমি করে নিচ্ছি। তুমি আগে এটা দিয়ে এস।'

যদি রতন না থাকত, তাহলে রীনা কত স্বচ্ছন্দে এই দরজাটা খুলে রেখে তার কাজকর্ম করতে পারত! রতনকে বিদায় করা দরকার।

মিনিট পাঁচেক পরে সদর দরজা খোলার ও বন্ধের শব্দ হল। গ্লাসের চা নিয়ে রীনা ঘরে ঢুকল। শিকল খুলল।

'জানালার পর্দা টেনে দিয়েছি।'

রাহুল বেরিয়ে এসে চায়ের গ্লাস নিল। খাটে বসল। রীনা নিজের চায়ের কাপ নিয়ে এসে প্যাকেটটা খুলছে।

পাউরুটি বিস্কুটের প্যাকেট, জেলির শিশি। রাহুল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

'সব সময় তো খাবার দাবার দিতে পারব না– এগুলিই খেও তখন।'

'ভালই করেছ।'

'হাতে করে আসার সময় ভয় করছিল।' শাড়ি খুলতে খুলতে রীনা পিছন ফিরে দাঁড়াল।

'ভয়! কি জন্য?' রাহুল বিস্কুটের প্যাকেট ছিঁড়ে একটা বার করল।

'পুলিশের ওয়াচ তো নিশ্চয় আছে। হাতে এত খাবার নিয়ে যেতে দেখে সন্দেহ করতে পারে।'

'এসব জিনিস তো সব পরিবারেরই প্রায় দরকার হয়, এতে সন্দেহ করার কি আছে।'

'কিছুই নেই, কিন্তু এখন আমাকে সব ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে। চলাফেরা, কথা বলা, কেনাকাটাতেও পর্যন্ত। নতুন কুঁজো কিনে দিতে পারিনি, যদি কেউ মনে করে হঠাৎ এখনই কিনা পুরনোটা ভাঙল। তোমার দুটো প্যান্ট লন্ড্রিতে রয়েছে। আনতে পারছি না .... অদ্ভুত একটা কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, কিছুই আর

স্বাভাবিকভাবে করতে পারছি না। বাইরে বেরোলেই মনে হয়, কেউ যেন লক্ষ্য করছে, ফলো করছে।'

শাড়ি পরা হয়ে গেছে। রাহুল দ্বিতীয় বিস্কুট দাঁতে ভাঙল। প্যাকেটটা রীনার দিকে বাড়িয়ে ধরল। একটা তুলে নিয়ে সে কাপে চুমুক দিয়ে রাহুলের পাশে বসল। দু'জনে কিছুক্ষণ নিজেদের চিন্তায় ডুবে গেল।

'রতনকে কোথায় পাঠালে।'

'নন্দিতার কাছে। আজ এগারো দিন স্কুলে আসছে না, পা ভেঙে পড়ে আছে। কিন্তু সেজন্য নয় পরশুর আগের দিন খবর পাঠিয়েছিল, ওর হাতে কাজের লোক আছে, অল্পবয়সী, বিবাহিতা, দেশ থেকে সবে এসেছে। পাঠিয়ে দেবে কিনা জানতে চেয়েছে।'

'কি লিখলে?' রাহুল উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল। 'রতনটা খুব অসুবিধা করছে?'

রীনা একটু অবাক হয়ে বলল, 'রতনকে ছাড়াতে বললে তুমিই তো আপত্তি করতে– যাক বুড়ো মানুষ, এই বয়সে যাবে কোথায়, কে ওকে কাজ দেবে এই সব বলে তো আমাকে বোঝাতে! এখন বলছ অসুবিধা করছে?'

'হ্যাঁ বোঝাতাম। তখন অবস্থাটা অন্যরকম ছিল।'

'কার অবস্থা? আমার, এই সংসারের না রতনের?'

'আমার অসুবিধাটা কি একটা গুরুত্ব পাবার মত ব্যাপার নয়?'

'কিন্তু রতনকে নিয়ে এখন আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না, আর এটাও আমার কাছে এখন খুব দরকারী ব্যাপার, কেন না আমাকেই এখন সব কিছু টানতে হবে। পাড়া, প্রতিবেশী, স্কুলের কলিগরা ছাড়া পুলিশও আছে। সবাই এখন আমায় এড়িয়ে চলছে। অনু ... যে দিনে দুবার অন্তত আসত, সে পর্যন্ত গত চারদিনে একবার এসেছে, তাও লুকিয়ে, তাও সীতাংশুর সঙ্গে দেখা করতে। এই যখন অবস্থা, হঠাৎ কাজের লোককে ছাড়িয়ে দিলে – '

'কেউ সেটা অত তলিয়ে দেখতে যাবে না।'

'যাবে কি যাবে না তা আমিও জানি না, তুমিও জান না। ঘরে বসে থাকা এক জিনিস, আর বাইরে সব কিছু ফেস করা আর এক জিনিস।'

'বাইরেরটা কি জিনিস তা আমি তোমার থেকে ভালই জানি।'

'হ্যাঁ জান। বাইরে গিয়ে কি ফেস করেছ, তাতো আর লোকের কাছে বলার মত নয়।'

'কি করেছি বাইরে?'

'রেপ .... মার্ডার। এর থেকে নোংরা, জঘন্য আর কিছু মানুষে করতে পারে?'

রীনা উঠে দাঁড়িয়েছে। চাহনিতে আগুন। দু'চোখের মনি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নাকের পাটা ফোলা। ঠোঁট দুটো ঘৃণায় অবজ্ঞায় দোমড়ান। দেহটা ঈষৎ ঝোঁকান।

'আমি রেপ করিনি.... মেয়েটাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিনি।' ধীরে ধীরে দাঁত চেপে সে বলল। খুন করার কথাটা বলতে গিয়েও বলল না।

'সাফাই গেয়ো না।' রীনা চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'তুমি আমাকেও জড়িয়েছ তোমার পাপের সঙ্গে।'

'তোমাকে জড়িয়েছি!'

একটা মার্ডারারকে শেল্টার দিলে আইন কি বউ বলে আমাকে ছেড়ে দেবে?'

রাহুল অবুঝ অবোধ শিশুর মত রীনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যাকে দেখছে সে অন্য এক রীনা। একে সে চিনতে পারছে না।

'নন্দিতাকে জানিয়ে দিলাম কাজের লোকের এখন দরকার নেই।'

রাহুল উঠে দাঁড়াল শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে ধীর পায়ে সে নিজের কুঠুরিতে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করল।

একটু পরেই দরজার একটা পাল্লা ফাঁক হল। কাগজের প্যাকেট মেঝেয় নামিয়ে রেখে রীনা দরজা বন্ধ করল।

অনেকক্ষণ পর রাহুল পাল্লার জোড়ে চোখ রেখে দেখল বিছানায় উপুড় হয়ে রীনা, বোধহয় কাঁদছে। সে বুঝতে পারছে, ওর মানসিক যন্ত্রণা। যে অবস্থার মধ্যে পড়েছে, সেটা তারই তৈরি। রীনার সহ্য শক্তি যে এতখানি, রাহুল এখন তা অনুভব করছে। ভয় শুধু তো তার একারই নয়, রীনাকে ভাগ নিতে হয়েছে। চাপের মধ্যে পড়েও বুদ্ধি হারায়নি। খুঁটিনাটি সাবধানতার দিকে হুঁশ রেখেছে। সব থেকে বড় কথা, তাকে সহ্য করছে। রেপ, মার্ডার এই সব সত্ত্বেও তার প্রতি মমত্ব বোধটা হারায়নি। ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মাঝ রাতে রাহুল কুঠুরি থেকে বেরোল। বাথরুমে যাবে। অন্ধকার শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে তখন রীনা চাপা স্বরে বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাথরুমে ... তুমি ঘুমোওনি?'

'দাঁড়াও।' রাহুলের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে, রীনা খাট থেকে নেমে এল, টর্চের আলো পড়ল মেঝেয়।

'আগে আমি দেখি রতনকে। তারপর যেও।'

সন্তর্পণে, সময় নিয়ে রীনা খিল নামাল। টর্চ জ্বেলে ডাইনিং দালানটা দেখে এসে বলল, 'যাও বাঁদিক দিয়ে।'

বুড়ো মানুষটা কাত হয়ে হাঁটু মুড়ে অঘোরে। মুখ হাঁ হয়ে রয়েছে। কণ্ঠার আর পাজরের হাড়গুলো প্রকট। রাহুল তার পাশ দিয়ে পা টিপে বাথরুমের দরজায় পৌঁছতেই রীন টর্চ নিভিয়ে ফেলল।

রাহুল যখন বেরিয়ে এল রীনা তখনও দালানে দাঁড়িয়ে। টর্চ জ্বেলে পথ দেখাল। আসার সময় থমকে, রাহুল বারান্দার পাঁচিল থেকে ঝুঁকে দু'ধারে তাকিয়েছিল। রীনা মুখে শব্দ করে উঠতেই তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসে। দরজা বন্ধ করে রীনা খিল এঁটে দিল।

'রাত্তিরে অনেকেরই ঘুম হয় না, জানালা কি বারান্দায় দাঁড়ায়।'

রীনা চাপা গলায় বলল।

'তুমিও ঘুমোওনি।' রাহুল মৃদু শান্ত স্বরে, অন্ধকার মূর্তির মত রীনাকে লক্ষ্য করে বলল।

'আমার জন্য তোমার ভাবতে হবে না, শুয়ে পড়ো .... মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, ঘুম এসে যাবে।'

'না। রীনা খাটে উঠল। বালিশটা সামান্য সরিয়ে শোবার উদ্যোগ করে বলল, 'যাও শুয়ে পড়ো তুমি।'

'যাচ্ছি।' কিন্তু রাহুল বসেই রইল। রীনা বিছানায় ছড়িয়ে দিল দেহভার। কিছুক্ষণ তারা কথা বলল না।

রাহুল ঝুঁকে বাঁ কনুইয়ে ভর রেখে রীনার মুখের কাছে মুখ আনল। 'তুমি খুব ক্লান্ত।'

রীনা চুপ। রাহুল ডান হাতের তালু ওর কপালে রাখল।

'ঘুমোবার চেষ্টা কর।' রাহুলের তালু অত্যন্ত কোমলভাবে রীনার কপাল থেকে গালে, চিবুকে, নাকে, ঠোঁটে, মন্থর গতিতে সঞ্চালন করতে লাগল। রীনা প্রত্যাখান করছে না, তালুটা গলা বেয়ে কাঁধের প্রান্তে পৌঁছল। রীনা ব্লাউজ খুলে রাত্রে শোয়।

‘থাক।’ একসময় রাহুলের হাতটা চেপে ধরল রীনা। ‘এবার শুতে যাও।’

‘আর একটু ... তোমার ভাল লাগবে। তুমি অত্যন্ত টেনসড হয়ে রয়েছে, এবার আলগা হও। নার্ভগুলো এলিয়ে পড় ক।’

রীনা প্রতিবাদ জানাল না। শুধু মুখ থেকে একটা ক্ষীণ শব্দ বেরিয়ে এল। রাহুলের মনে হল তার কথাগুলোকে সমর্থন করেই যেন রীনার দেহটা শিথিল হয়ে আসছে। বহুদিন, বহু মাস হয়ে গেল এমন যত্নে সে রীনার শরীরে হাত দেয়নি। এত মায়া, এত মমতা নিয়ে ওর বুকে হাত বুলোয়নি।

রাহুল ঝুঁকে রীনার কপালে ঠোঁট রাখল। তারপর চোখের উপর এবং ওষ্ঠে। ধীরে ধীরে সে বিছানা রীনার পাশে বিছিয়ে দিল। চুম্বনকে ক্রমশ গাঢ় এবং তীব্র করে তুলল।

‘এবার যাও।’ রীনার স্বরে দুশ্চিন্তার আভাস।

‘বহুদিন এত ভাল লাগেনি তোমাকে চুমু খেয়ে--- তোমার কষ্ট, তোমার দুঃখ --- বেদনা অনুভব না করলে বোধ হয় এই ভাল লাগাটা পেতাম না।’ রাহুল কথাগুলো বলল রীনার অনাবৃত বুকের মাঝে মুখ চেপে রেখে। তার মনে হল রীনার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল।

‘রীনা আমি এভাবে বন্দী হতাম না, চার দেয়ালের ওই কুঠুরিটায় আমি ঘুমাতাম না, যদি মেয়েটার চীৎকার শুনে থমকে না দাঁড়াতাম। আমি তো সেটা অগ্রাহ্য করে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে, যা হচ্ছে হোক গে আমার কি, এমন একটা ভাব করে না’ও তো দাঁড়াতে পারতাম! কিন্তু দাঁড়ালাম কেন?’

রীনার শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হয়ে আসছে। যেন দম বন্ধ করে রেখে অপেক্ষায় থাকবে উত্তর শোনার জন্য। রাহুল মুখ তুলে বলল, ‘আমি শুধু এইটাই ভেবেছি এই ক’দিন ধরে। উত্তর পাইনি। মানুষ বিপদে এগিয়ে যায় কেন? তুমি কি এর উত্তর জান?’

‘না’। ক্ষীণ স্বরে জবাব এল। রাহুল জানে এই শব্দটি ছাড়া রীনার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব হবে না।

‘বহু লোক অন্যকে বিপদের মধ্যে দেখে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, কেন যায় জান?’

‘না’।

‘আমাদের সম্পর্কটা আগের মত রাখা সম্ভব হবে কি?’

রীনা নিরুত্তর রইল। রাহুল হঠাৎই তীব্র একটা আবেগে আচ্ছন্ন হতে শুরু করল। সে রীনার দুই ঠোঁট মুখের মধ্যে ভরে দাঁত দিয়ে চাপ দিল। তারপর নিজেকে টেনে রীনার দেহের উপর তুলল।

‘না, না ... অসম্ভব।’

‘কেন অসম্ভব?’ রাহুল প্রশ্নের মত দাবি জানাল। বহুদিন পর সে কামনার প্রবল সাড়া দেহে পেয়েছে। এটা সে নষ্ট হতে দেবে না। এখন খুবই অনিশ্চিত তার ভবিষ্যৎ। কে জানে এটাই হয়তো তার শেষবার।

‘রাহুল না, সম্ভব নয়... আমি পিল খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কিছু হয়ে গেল আর মুখ দেখাতে পারবো না।

এরপরই রাহুল এমন একটা কথা বলে ফেলল যেটা বলার জন্য সে পর মুহূর্তেই অনুতাপ করেছে।

‘কিছু হবে না তোমার। অনেক আগেই ডাক্তার দিয়ে নিজে পরীক্ষা করিয়েছি, আমার কখনো সন্তান হবে না।’

রীনার চাপা আর্তনাদটা রাহুলের মুখের উপর এমন জোরে আঘাত করল যে তার মুখ অসাড় হয়ে গেল।

‘লুকিয়ে রেখেছিলে। কিন্তু আমি যে চাই-- একটা অন্তত।’

রীনার বুকভাঙা স্বরে রাহুল যেন ছবির শেষবারের চীৎকারটার রেশ শুনতে পেল। ধীরে ধীরে সে বুকের ওপর

থেকে নেমে এল।

দু'হাতে রীনা মুখ ঢেকেছে। অন্ধকার ঘর। রাহুলের মুখ দেখবে না বলে কিংবা তার নিজের মুখ না দেখানোর জন্য বা শোকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এটাই। রাহুল ভাবল, খবরটা কেন ওকে জানাতে গেলাম? এটা কি এমন জরুরি, যে আজ রাতেই ধৈর্য, সংযম, অপেক্ষা কি করা যেত না? শরীরের তাড়নায় যুক্তি, বুদ্ধি হারানো এমন অন্ধত্ব তাকে পেয়ে বসল কেন? তা হলে লোকগুলোর সঙ্গে তার তফাত কোথায়?

খাট থেকে নেমে রাহুল নিজের কুঠুরিতে ফিরে এল। নিজ হাতে দরজা বন্ধ করল। পা ছড়িয়ে বসে প্রথমেই তার মনে হল, বাঁশের খোঁটা হাতে নিয়ে কেউ একজন এবার তার দিকে এগিয়ে আসবে। কবে আসবে তা সে জানে না।

বেডকভারটা টেনে আনার জন্য সে হাত বাড়াতেই হাতুড়িটা হাতে ঠেকল।

॥ ৪ ॥

রতনের দাঁতে যন্ত্রণা হয়। দাঁতটা তুলে ফেলে দিতেই হবে। রীনা বলেছিল, টাকা দিচ্ছি ডাক্তারের কাছে গিয়ে তুলিয়ে ফেল। রতনের আপত্তি টাকা খরচ করায়। সে জানতে পেরেছে, ঠিকে ঝি কমলের মা একই যন্ত্রণায় ভুগছে এবং ডেন্টাল হসপিটালে গিয়ে দাঁত তুলিয়ে আসবে। রতন অতঃপর কমলের মা'র সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলে, সেও ওর সঙ্গে যাবে দাঁত তোলাতে।

এসব কথা রাহুল জানল যখন রীনা রাতে তাকে বলল, 'রতন কাল সকালেই দাঁত তোলাতে যাবে। ফিরবে কখন ঠিক নেই, হয়তো দুপুরে আসবে।'

'তা হলে কে ওকে দরজা খুলে দেবে? তুমি তো সাড়ে নটার বেরোবে।'

'বাইরে তালা দিয়ে চাবিটা অনুর কাছে রেখে যাব, রতন এসে চেয়ে নেবে'

সকালে ঘুম ভাঙতেই রাহুলের প্রথমেই মনে হল, রতন আছে না বেরিয়ে গেছে। অন্যান্য দিনও রতন বেরোয় দুধ আনতে। তারপর বাজারে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে। আজ রতন টানা অনেকক্ষণ বাইরে থাকবে। হাসপাতালটা কাছে নয়। আর বিনি পয়সায় চিকিৎসা করাতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। রাহুল ধরে নিল, দুপুর পর্যন্ত সে এই ফ্লাটে স্বাধীনভাবে থাকছে।

দরজা খুলে রীনা বলল 'রতন দাঁত তোলাতে চলে গেছে। বাথরুমে যেতে পার।'

রাহুল শোবার ঘরের দরজা থেকে হামা দিয়ে বাথরুমে গেল। এই ভাবে যাওয়াটা এখন তার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। রীনাও আর তাকে লক্ষ্য করে না। তবে ওই সময়টা সে পাশের বাড়ির দিকে চোখ রাখে, তারপর হাত নেড়ে তাকে এগোবার জন্য ইশারা করে। ততক্ষণ রাহুল মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে রীনার দিকে। শুধু এই সময়টুকু সে নিজেকে একটু অন্যরকমভাবে। করুণাপ্রার্থী একটা অসহায় জন্তু, রীনা তার মনিব।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা এই সময়টুকুতে আর থাকে না। তার লেখাপড়া, ব্যায়াম করা, শিক্ষা, রুচি, কান্তি, বিত্ত সব নিশ্চিহ্ন হয়ে সে একটা চতুষ্পদ ছাড়া নিজেকে আর কিছুই মনে করতে পারে না। রীনা সেদিন রাতের পর নিস্পৃহ, আচরণে আবেগবর্জিত। কর্তব্যে যথাযথ। রাহুল খবরের কাগজ চোখের সামনে রেখে কান রাখল দালানে। রীনা রান্নাঘরে আর দালানে কাজের জন্য চলাফেরা করছে, মাঝে একবার ঘরেও এল। কোলকাতার সকাল তার নিজস্ব শব্দ তৈরি করে যাচ্ছে। সূর্যের আলো পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রতিদিনের মত অভ্যস্ত জায়গায় পড়ছে।

রাহুলের চোখ ঘরে চারদিকটা ঘুরে এল। ঘরটা একই রকম রয়েছে এখনো। অধিকাংশ আসবাব তার পছন্দেই কেনা। রীনা চেয়েছিল রাবার ফোম গদির খাট। শির দাঁড়ার নানান ব্যাধির ভয় দেখিয়ে সে তুলোর গদি আর তোষকের খাট কেনে। প্রত্যেকটা আসবাবই তার জীবনের পটভূমির এক একটা অংশ। একদিন আর তা

থাকবে না। রীনা একার রোজগারে হয়তো চালাতে পারবে না। তখন কি টিভি, রেডিও, খাট, ফ্রিজ বিক্রি করে দেবে?

রীনা স্নান করে ভাত খেল, স্কুলে যাবার জন্য শাড়ি পরল। থালা হাতে ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমার ভাত এই টেবিলে রেখে যাচ্ছি, রতন আসার আগেই তোমার ঘরে তুলে নিয়ে যেও।

চাবিটা অনুর কাছে রেখে যাচ্ছি।'

রাহুল কাগজে চোখ রেখে মাথা নাড়িয়ে একটা শব্দ করল। সে জানে রীনা কথাটা বলেই ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেছে। তার মাথা নাড়া দেখার জন্য ইচ্ছুক নয়।

রীনা চলে যাবার পর আধঘণ্টা কি তারও বেশি সময় কেটে গেছে, হিসাবটা রাহুল আর করার দরকার বোধ করেনি। এখন তার কাছে সময়ের কোন দাম বা দরকার নেই। সে পাখার গতি বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে। তন্দ্রা মাঝে মাঝে চেতনাকে ঢেকে দিচ্ছে। তবু জেগে থাকার চেষ্টা করছে। রতন এসে যেন তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় না দেখে ফেলে।

হঠাৎ তার মনে হল সদর দরজায় তালা খোলার শব্দ হল। স্প্রিং-এর মত বিছানায় উঠে বসল। শোবার ঘরের দরজাটা খোলাই। দরজায় খিল আঁটার শব্দ শুনতে তার ভুল হল না। সে দু'লাফে কুটুরিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। জোড়ের ফাঁকে চোখ রেখে সে অপেক্ষা করতে লাগল। এত তাড়াতাড়ি রতন ফিরে এল!

ঘরে ঢুকল অনু। প্রথমেই তাকাল ঘুরন্ত পাখার দিকে। হাসল। রাহুল খুবই অবাক হয়ে যায় ওকে দেখে। কেউ চাবি গচ্ছিত রেখে গেলেই কি তালা খুলে তার ঘরে আসা উচিত। কিন্তু পাখার দিকে তাকিয়ে হাসাটা দেখেই ভয়ে সিটিয়ে গেল। নিশ্চয় মনে মনে প্রশ্ন তুলবে, কেন ঘুরছিল, কে হাওয়া খাচ্ছিল, সে তা হলে গেল কোথায়? ওই দরজা বন্ধ ঘরটায় কি?

অনু পাখার সুইচ বন্ধ করে, পা টিপে জানালার কাছে গেল। পর্দা সরিয়ে বাইরে দুধারে, উপরে সন্তর্পণে নজর বোলাল। তার পরে শাড়ির আঁচল বার করে কয়েকবার নাড়ল। দু'পা পিছিয়ে এসে অনু দাঁতে আঙুল চেপে জানালার দিকে তাকিয়ে কি ভাবতে লাগল। রাহুল দেখল মেয়েটির গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কপালে ঘাম ফুটেছে, আর দু'চোখে অস্বাভাবিক চাইনি। অনু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কি ব্যাপার! আঁচাল নেড়ে কি করল! কাউকে ইশারা? সঙ্কেত জানাল? উদ্দেশ্য? অনু কি চলে গেল, নাকি ফিরে আসবে। পাখাটা বন্ধ করার সময় ও কি ভেবেছিল?

আবার খিল তোলার শব্দ। অনু বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে। রাহুল দরজাটা ফাঁক করল আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল। চাপা গলায় কে কথা বলল?

সীতাংশু ঢুকল, পিছনে অনু। উত্তেজনায় টসটসে দু'জনের মুখ। কথা না বলে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পর ওরা হাসল।

'তুমি এমনভাবে দোকানে ঢুকলে, মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কি যেন ঘটেছে।'

'চাকরটা দুপুরের মধ্যেই ফিরবে, তাই ছুটতে ছুটতে গেছি।'

'দাদা কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দোকানে আসবে কর্মচারীদের হাতে দোকান ফেলে বেরিয়েছি শুনলে ভীষণ রেগে যাবে।'

'যাবে তো যাবে আমার জন্য বকুনি খেতে পারবে না?'

সীতাংশু একগাল হাসল। অনুকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেতে গিয়ে জানালার দিকে তাকাল।

'বাইরে থেকে দেখা যায়?'

‘পর্দা টানা আছে তো।’

‘তা হলেও বন্ধ করেছি।’ সীতাংশু আর অনু জোড়ের ফাঁক থেকে সরে গেল। দুই ধাপে ঘর অন্ধকার হল। দরজা দিয়ে যতটা আলো আসা উচিত, আসছে না রীনার শাড়িতে বাধা পেয়ে। ওদের আর রাহুল দেখতে পাচ্ছে না।

‘কেউ এসে পড়বে না তো?’

‘দরজায় খিল দেয়া।’

‘তবু যদি কেউ এসে পড়ে?’ সীতাংশুর গলা।

‘তুমি বড্ড ভীতু।’ অনুর মিষ্টি ধমক।

কিছুক্ষণ পর সীতাংশুর গলা ‘ভাত না খেয়েই স্কুলে গেছে।

পাখাটাও নেভাতে ভুলেছেলো’

‘মাথার ঠিক নেই– এই বয়সে একা থাকা। বৌদির কোমর -বুক পেট দেখেছ কি দারুণ না?’

‘তোমার ছাড়া আমি আর কারুর দেখি না।’

কথা আর হচ্ছে না। রাহুলের চোখের পাতা দরজার কাঠে ঠেকে গেল। উপরে-নিচে জোড়ের নানান জায়গা থেকে সে দেখার চেষ্টা করল। দেখতে পাচ্ছে না দু’জনকে।

‘আমি অত বড় করে লিখি, আর তুমি অতটুকু করে উত্তর দাও কেন?’ সীতাংশুর অনুযোগ।

‘আমাদের কি তোমাদের মত অত বড় বাড়ি যে নিরিবিলিতে লেখার যায়গা পাব।’

আবার কথা বন্ধ হল। রাহুল আর দেখার চেষ্টা করল না। এখন তার শিরার মধ্যদিয়ে তরল আগুন শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। থরথরিয়ে হাঁটু কেঁপে উঠতেই সে উবু হয়ে বসে পড়ল। দু’হাতে উরু জড়িয়ে হাঁটু চেপে তার যন্ত্রণাকে দমিয়ে নিল।

‘না খাটে নয় ... বৌদি এসে ঠিক বুঝতে পারবে।’

‘কি করে পারবে?’

‘বিছানায় পুরুষ মানুষ শুলে গন্ধ লেগে যায়।’

‘সব বাজে কথা।’

‘হ্যাঁ গো, পুরুষের গায়ের আলাদা গন্ধ আছে।’

‘ তাহলে মেঝেয় ...’

‘কিছু হবে না তো? ... তাহলে কিন্তু গলায় দড়ি দিতে হবে।’

রাহুল বুঝতে পারল না ঘড়ঘড়ে চাপাস্বরে সীতাংশু কি বলল, সে শুনল শুধু অনুর গলা, ‘মহা শয়তান তুমি, আগে থাকতে ভেবে পকেটে করেই নিয়ে এসেছ... আগে বলো আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না।’

‘না বাসব না।’

‘গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।’

‘কাউকে ভালবাসব না, কোনদিনও নয়।’

‘যদি আমাদের বিয়ে না হয়।’

‘কেন হবে না। জাতটাত নিয়ে এখন আর কেউ অত আপত্তি করে না। আর যদি করে ... বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ে করব। তোমার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে–।’

সীতাংশুর কথা শেষ হল না কেন? রাহুল জোড়ের ফাঁকে চোখ রেখে ওদের খুঁজতে লাগল। খাটের ওধারে মেঝেয় দু’জোড়া পা সে দেখতে পেল। পায়ের অবস্থান, নড়াচড়া দেখে সে জানতে পারছে দুজনে কি করছে।

রাহুল হাঁটু গেড়ে মেঝেয় কপাল ঠেকিয়ে সে সহ্য করতে পারছে না শোবার ঘরের ঘটনাটা। তার মনে হল, অনু যা করছে, শীতাংশু যা করছে, কিছুই এমন অন্যায় নয় যে তাকে দরজা খুলে বেরিয়ে ওদের ভয় পাওয়াতে হবে। তার অসহ্য লাগছে, এটা চোখের ওপর ঘটছে কেন? এটা কি তার জন্য শাস্তি? বেচারারা জানে না, একজন তাদের দেখতে পাচ্ছে। এটা যদি ওরা জানতে পারে তা হলে কি মানসিক অবস্থার মধ্যে পড়বে? ভয়ে সিটিয়ে থাকবে ছেলে মেয়ে দুটো।

ওদের কি ভয় দেখাব?

রাহুল এটা ভেবেই মেঝেয় মাথা ঠুকল। তার মন নোংরা হয়ে গেছে। ভয় দেখানোর মত নীচ কাজ করার কথা সে ভাবতে পারল কি করে। বেশ তো আছে ওরা নিজেদের মত ভালবেসে। ওষুধের দোকানের মালিকের ছেলে, পাড়ার অর্ধশিক্ষিত মেয়ে। বিয়ে হতে পারে, নাও পারে। কিন্তু ওদের জীবনে এই মুহূর্তগুলো রাহুলের মনে পড়ছে, তার জীবনেও এমন ধরনের মুহূর্ত বিয়ের আগে এসেছিল। কিন্তু তাই নিয়ে সে আর ভাবতে চায় না।

আবার সে দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। সীতাংশুর বুকে মাথা রেখে অনু কাঁদছে। সুখের কান্না।

‘আমি এবার যাই, দোকান ফেলে রেখে এসেছি।’ বুকে মুখ ঘষে অনু চোখের জল মুছল।

‘তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।’

রাহুলের মনে হল, পৃথিবীটা একই রয়ে গেছে শকুন্তলা, সীতার আমল থেকে।

‘আমারও কেউ নেই তুমি ছাড়া।’

‘বিয়ের কথাটা বাড়িতে তাড়াতাড়ি তুলো।’

‘তুলব।’

‘রাজি না হলে, আলাদা হয়ে যাবে তো?’

‘যাব... এইবার যাই, দাদা আসার আগেই–’

সীতাংশু বুক থেকে অনুকে সরিয়ে দিল। রাহুল হাসতে শুরু করল। ছেলেটা পারবে না, মেয়েটাও ছাড়বে না।

এবার ওরা বিদায় হোক এই ফ্ল্যাট থেকে।

‘আমি কিন্তু বিষ খাব যদি তোমাকে না পাই।’

‘না অনু তোমাকে মরতে দেব না, তা হলে আমিও–’

সীতাংশুর মুখ চেপে ধরল অনু, তারপর কামনা ভরা তীব্র চুম্বন করতে করতে দু’জনে খাটের ওপর পড়ল।

রাহুল চোখ সরিয়ে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তার ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

এক সময় ওরা দু’জন চলে গেল। এক সময় রাহুল ঘর থেকে বেরিয়ে ভাত খেয়ে নিল। রতন ফিরে এল।

রীনা ফিরল জ্বর নিয়ে। খাটে শুয়ে সে রতনের কাছ থেকে জেনে নিল হাসপাতালের ডাক্তার কি কি বলেছে। রতন প্রেসক্রিপশন দেখাল। ওষুধগুলো খেয়ে সাতদিন পর যেতে বলেছে, সবগুলো দাঁতই তুলে ফেলতে হবে।

রীনাকে অনু-সীতাংশুর ব্যাপারটা রাহুল বলল না। রীনা আলো নিভিয়ে শুয়ে রইল সারা সন্ধ্যাটা। রতন জানতে চাইল খাবে কিনা।

'তুমি এখানে ঢাকা দিয়ে রেখে খাও। রাতে খিদে পেলে খাব।'

রীনা খায়নি। রাতে শোবার ঘরের দরজা সে খিল দিয়ে এখন শোয়। আজ কোনক্রমে উঠে খিল দিল। রাহুল তখন কুঠুরি থেকে বেরোল।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে রাহুল জিজ্ঞাসা করল।

'দুপুর থেকে গা গরম লাগছিল। শরীরটা জ্বর জ্বর লাগছে... ক্রমশই যেন বাড়ছে। খুব ক্লান্ত–।'

'থার্মোমিটার তো আর কেনা হয় নি?'

'না'।

রীনার কপালে তালু রেখে রাহুল উদ্বেগবোধ করল। জ্বর অন্তত একশো দুই-তিন। ভাইরাস ইনফেকশনই বোধহয়।

'গায়ে ব্যথা?'

'হ্যাঁ... ভীষণ'।

'খাবে কিছু?'

'না, খাবারটা তোমার জন্য, খেয়ে নাও।'

দুধ, সেঁকা পাউরুটি আর একটা বাটিতে পাতলা ডাল। রাহুল গোগ্রাসে খেয়ে নিল। এখন তার একটা কথাই মনে হচ্ছে। জ্বর বাড়লে রীনার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হবে। রতন নিশ্চয়ই ওকে ডাল ভাত-মাছ রেঁধে দেবে না। তখন কে তাকে লুকিয়ে ভাত বা রুটি খাওয়াবে।

'কাল রতনকে দিয়ে ক্রোসিন বা নোভালজিন আনিয়ে খেয়ে নিও।'

'... আর দু'প্যাকেট বিস্কিট। একটা থার্মোমিটারও কিনতে দিও।'

রাহুল তার কথার কোন সাড়া না পেয়ে রীনার কপালে আবার তালু রাখল। বেহুঁশের মত চিত হয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস খুবই ধীর। তার মনে হল, এখন মাথায় আইস ব্যাগ দিলে জ্বর নামবে। কিন্তু ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে আইস ব্যাগে ভরে কে মাথায় ধরবে? কাল সকালের আগে কিছু করা যাবে না। কিন্তু সকালেই বা করবে কে? রতনের নিশ্চয়ই ধারণা নেই এ ক্ষেত্রে কি করা দরকার? বড়জোর হয়তো কপালে জলপটি দেবার কথা ভাবতে পারে। রীনা ওকে দিয়ে আইসব্যাগটা আলমারি থেকে বার করিয়ে, কি করতে হবে যদি বলে দেয়!

সে আলমারি খুলল। কাজ এগিয়ে রাখার জন্য টর্চ জ্বেলে কাপড়ের স্তূপ সরিয়ে আইসব্যাগটা বার করে টেবিলে, চোখে পড়ার মত জায়গায় রাখল। খাটে শোবে কিনা তাই নিয়েই সে দ্বিধায় পড়ল। যদিও ঘুমের মধ্যে সে নড়াচড়া করে না, তবু অসুস্থ মানুষের পাশে শুলে বীজাণু সংক্রমিত হতে পারে। দু'জনেই শুয়ে পড়লে ব্যাপারটা তখন বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে যাবে।

রাহুল মেঝে শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কানোর শব্দে। প্রথমে সে বিরক্ত হয়ে দরজার দিকে তাকাল। তারপরই উঠে দাঁড়াল বুকের মধ্যে বরফ নিয়ে।

‘বৌদি দরজা খুলুন... অ বৌদি। রতনের উৎকণ্ঠিত চীৎকারের সঙ্গে দরজায় অধৈর্য করাঘাতও চলছে।

রাহুল খাটে শোয়া রীনার দিকে তাকাল। চোখ মেলে দিশেহারার মত তাকাচ্ছে। ওঠার ক্ষমতা নেই। রাহুল বাইরে রতনকে আশ্বস্ত করার জন্য মেঝেয় রাখা থল-বাটিতে পা দিয়ে ধাক্কা দিল। এতে কাজ হল। করাঘাত বন্ধ করে গলা নামিয়ে রতন বলল ‘বৌদি দেখে পা ফেলুন।’

রীনাকে দু’হাতে ধরে প্রায় হিঁচড়ে রাহুল খাট থেকে নামাল। শাড়ি খুলে কোমর থেকে ঝুলছে। চুল আলু থালু। তাকে টেনে নিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড় করাল। খিলটা ধীরে ধীরে তুলে, টলে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থায় থাকা রীনার একটি হাত খিলের ওপর রেখেই রাহুল ছুটে কুঠুরিতে এসে দরজা বন্ধ করল। সে একই সঙ্গে রীনার এবং খিলটা পড়ে যাওয়ার শব্দ পেল। ‘দেখেছ কাণ্ড। এমন বেহুঁশ জ্বর নিয়ে উঠে আসা-আর খিল দিওনা দরজায়... উঠতে পারবে?’

জোড়ের ফাঁকে চোখ দিয়ে রাহুল বাকিটা দেখল। বুড়ো রতন দু’হাতে রীনাকে বগলের নীচ থেকে জড়িয়ে টেনে দাঁড় করাল। ব্লাউজের দুটো হুক খুলে গেছে। হাত বাড়িয়ে কোনক্রমে রীনা খাট পর্যন্ত পৌঁছে খাটে উবুড় হয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বেরোচ্ছে। দু’টো পা ধরে রতন রীনাকে খাটে তুলে শুইয়ে দিল। মাথার নীচে বালিশ রাখল। ব্লাউজের হুক লাগানোর চেষ্টা করতে করতে রতন শেষ পর্যন্ত সফল হল। শাড়িটা যথাসম্ভব বিছিয়ে দিল গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। এত কিছু করার সময়, রাহুল লক্ষ্য করল, রতনের মুখে পিতৃস্নেহ মমতা আর উদ্বেগ টলটল করছিল।

এইবার সমস্যায় পড়ল রতন। এখন সে কি করবে? রাহুল ভাবল, আমি হলে কি করবো? প্রথম কাজ দৌঁড়ে ডাক্তার ডেকে আনা। রতনের হাতে টাকা নেই। রীনার হাত ব্যাগে পঞ্চাশ ষাট টাকা থাকেই। রতন নিশ্চয়ই তা জানে... আর নয়তো কাউকে ডেকে আনা।

চিন্তিত মুখে রতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সদর দরজা খোলার শব্দ হল। রতন যাচ্ছে কোথায়? উপরের গৌতমবাবুর কাছে? রাহুল অপেক্ষা করতে লাগল। শোবার ঘরে দীর্ঘশ্বাসের মত কাতর শব্দে রীনা বুঝিয়ে দিচ্ছে সে এখন যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে।

রতন ফিরল, সঙ্গে অনু। কপালে, গলায় তালু ছুঁইয়ে অনু বলল ‘এ যে অনেক জ্বর... ডাক্তার ডাকতে হবে।’

‘আমি তো কিছুই জানি না। কোথায় ডাক্তার পাব... তুমি একটু ডেকে আনবে?’

‘দাঁড়াও, সীতাংশুকে বলছি। ওদের দোকানে ডাক্তার বসে।’ অনু বেরিয়ে গেল। রতন দাঁড়িয়ে রইল রীনার মাথার কাছে। বেচারার এখন কিছুই করার নেই। শুধু উৎকণ্ঠাভরে বার বার জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে, ‘খুব কষ্ট হচ্ছে বৌদি?... কোথায়, মাথায়? টিপে দেব? জল খাবে?’

রতন গ্লাসে জল এনে, রীনার ঘাড়ের নীচে বাহু দিয়ে তুলে জল খাওয়ার চেষ্টা করল। খেল কিনা রাহুল বুঝতে পারল না। রীনার মাথায় কপালে রতন হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ডাক্তার আর সীতাংশুকে নিয়ে অনু ফিরে এল। চারজন লোকের ভিড়ে রাহুল দেখতে পাচ্ছে না ডাক্তার কি পরীক্ষা করছে। স্টেথিস্কোপটার দুটো নল কানে লাগাল এই পর্যন্ত সে দেখেছে। আর দেখেছে সবাই উৎকণ্ঠিত চোখে ডাক্তারের মুখ লক্ষ্য করছে।

‘আইসব্যাগ তো রয়েছে দেখছি, মাথায় বরফ দেয়ার ব্যবস্থা কর। দোকানে চলো প্রেসক্রিপশন লিখে দেব। রেগুলার টেম্পারেচার নিতে হবে। ব্লাড টেস্ট করতে হবে... তুমি দুর্গা বাবুকে বল এখুনি এসে ব্লাড নিয়ে যাক।’

‘কি মনে হল?’ সীতাংশু জিজ্ঞাসা করল।

‘ব্লাড রিপোর্ট না পেলে বলা শক্ত... এনার আছেন কে?’ পেশাদারী গলায় ডাক্তার প্রশ্ন করল।

‘আপাতত কেউ নেই, শুধু এই কাজের লোকটি ছাড়া।’

ডাক্তার ভ্রু কুঁচকে রতনের দিকে তাকাল। 'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই!' সীতাংশু তাকাল অনুর দিকে। অনু রতনের দিকে।

'আমি তো কিছু জানি না, কাউকে কখনো আসতে দেখিনি। তবে ইস্কুল থেকে মাঝে মাঝে দু'একজন আসতেন।' রতন বিব্রত অসহায় মুখে তাকিয়ে রইল।

'ইনি তো বিবাহিত, হাজব্যান্ড কোথায়?'

'বাইরে আছেন... সে অনেক কথা, পরে আপনাকে বলব। চলুন।' সীতাংশু প্রসঙ্গটা চাপা দিতে দরজার দিকে এগোল।

'নিকট কারুর এখন কাছে থাকা দরকার।'

তিনজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রতন চুপ করে দাঁড়িয়ে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অনু ফিরে এল।

'আইসব্যাগে বরফ ভরে দিচ্ছি, তুমি ততক্ষণ মাথায় ধরো। আমি ওষুদের দোকান থেকে ঘুরে আসছি। আর বৌদি একবার আমায় বলেছিল ওর ছোট বেলার এক বন্ধু ওরই সঙ্গে স্কুলে পড়ায় সে হয়তো বৌদির বাপের বাড়ির ঠিকানা জানে। তুমি কি ওর নামটা জান?'

'না'।

'আচ্ছা আমি গিয়ে খুঁজে বার করে নোব।'

নন্দিতা পা ভেঙ্গে বাড়িতে পড়ে রয়েছে, অনু ওকে স্কুলে পাবে না, আর পেয়েও কি কোন লাভ হবে? রীনার বাপের বাড়ির কে'ই বা এখন আসবে? বাবা মৃত, মাকে নিয়ে ছোট ভাই চন্ডিগড়ে, ছোট বোন বিয়ে করে আছে সৎলেকে। নন্দিতা কারুর ঠিকানাই দিতে পারবে না, শুধু বিভন স্ট্রিটে বাপের বাড়ীটি ছাড়া।

নিকটজন বলতে একমাত্র আমি, রাহুল দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ভেবে চলল, সীতাংশুর কথামত 'বাইরে' আছি। অথচ রীনার থেকে এখন হাত দশেকও দূরে নই। থেকেও নেই। কোথাও এখন আমি নেই অথচ আমি বেঁচে আছি। এই রকম অবস্থায় কোন লোক কখনো কি পড়েছে? চোখের সামনে বৌ অসুখে মরবে আর স্বামী খুব কাছে থেকে হাত গুটিয়ে বসে সেটা দেখবে।

ভয়ে। প্রাণের ভয়ে। কি অসম্ভব মূল্যবান এই প্রাণভয় ব্যাপারটি। রাহুল চোখ বুজল বুকের বাঁ দিকে হাত রেখে। হৃদ্‌স্পন্দনটা অনুভব করতে পারল না। কব্জির কাছে দুটো আঙুল টিপে ধরল... পাওয়া গেছে, এটা যদি বন্ধ হয়!... এই যদিটাই হ'ল ভয়।

তাকে বাথরুমে যেতে হবে। তলপেটটা ফুলে ভারি হয়ে উঠেছে। কাল রাতের পর এখনো সে পেচ্ছাপ করেনি। অন্তত বারো ঘণ্টা তো বটেই। পায়খানাও যাওয়া দরকার। কাল রাতে দুধ পাউরুটির পর পেটে কিছু পড়েনি। রাহুল আকুল হয়ে শোবার ঘরের মধ্যে চোখ রাখল।

রতন আইসব্যাগ ধরে আছে রীনার মাথায়। মাঝে মাঝে তোয়ালে দিয়ে মুখ থেকে জল মুছিয়ে দিচ্ছে। এই বোড়াটা কি এখন কিছুক্ষণের জন্য ফ্ল্যাটের বাইরে যাবে না? রাহুলের মনে হ'ল এই কুঠুরিটায় নিশ্চয় কোন নর্দমা আছে। থাকা উচিত।

বন্ধ জানালার দিকের দেয়ালে সে মেঝের কাছে হাতড়াতে শুরু করল। একটা গর্ত যদি হাতে ঠেকে। তিনবার, চার বার সে দেয়ালের নীচের দিকটা আঙুল দিয়ে খুঁজল। নেই। ক্রমশ সে রেগে উঠতে লাগল। অদ্ভুত বাড়ি বানিয়েছে। ঘর তৈরি করেছে অথচ নর্দমা রাখেনি? গবেট, গাধা, উল্লুক। তার মনে হল, এই দিকের নয়, হয়তো অন্য দিকের দেয়ালে নর্দমাটা আছে। কিন্তু জিনিসপত্রের স্তূপে দু'দিকের দেয়াল চাপা। সে শব্দ না করে জিনিসগুলো সরিয়ে, জানালার দিকে আসতে লাগল। ভ্যাপসা গন্ধটা বন্ধ ঘরে আরো ঝাঁঝালো হয়ে উঠল। কয়েকটা পোকা তার হাত বেয়ে সরসর করে উঠে আসতেই সে হাত ঝাড়ল। তোরঙ্গে হাত লেগে শব্দ

হওয়া মাত্র সে চট করে জোড়ের ফাঁক দিয়ে তাকাল। রতন একইভাবে রীনার মাথায় আইস ব্যাগ ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শব্দটা শুনতে পায়নি।

রাহুল আঙুল দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মেঝের সংযোগের জায়গাগুলো আঁকড়ে যেতে লাগল। গর্ত এদিকেও নেই। ঘরের কোথাও নেই। তাহলে? প্রশ্নটা নিজেকে করেই রাহুল ট্রাউজার্সের চেন টানল।

ধীরে ধীরে তলপেট থেকে টনটনিটা নেমে যাচ্ছে। রাহুল চোখ বুজে চমৎকার একটা আরাম উপভোগ করে যেতে লাগল। ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে লাগছে। কোনের দিকে মেঝেয় জমে থাকবে। ওর ওপর ছেঁড়া তোষকটার তুলো ফেলে দিলেইতো ব্লটিং-এর মত শুষে নেবে। মনে হওয়া মাত্র রাহুল দাঁত দিয়ে তোষকের কাপড় ছিঁড়ে তুলো বার করে মেঝেয় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল। অন্ধকারে সে বুঝতে পারছে না তুলোগুলো ঠিক জায়গায় পড়ল কিনা।

শোবার ঘরে লোক এসেছে। রাহুল চোখ রাখল অনুর সঙ্গে একটি লোক। পিছন ফিরে খাটে বসে লোকটি রীনার হাত টেনে নিল। রক্ত নিতে এসেছে। পরীক্ষা করে কিসের বীজাণু পাবে? রাহুল ভাবতে লাগল, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডায়বিটিস, যক্ষ্মা, ক্যান্সার, আর কি হতে পারে? এনকেফেলাইটিস, এইডস? না এইডস নয়, কোথা থেকে এই রোগ পাবে? তার তো নেই। অন্য কারুর থেকে রীনা কি পেতে পারে? কিন্তু ও স্বামীর প্রতি খুবই বিশ্বস্ত। এ ব্যাপারে সন্দেহের ওপরে।

ছোট্ট হাতব্যাগে লোকটা তার সরঞ্জামগুলো ভরে উঠে পড়ল। তাকে এগিয়ে দিয়ে অনু ফিরে এল।

'তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে তো? না, না, এসব খরচের জন্য বলছি না, সীতাংশুদের দোকানে প্যাথোলজিরও কাজ হয় ওষুধেরও পয়সা লাগবে না। ডাক্তার বাবু ফী-ও দিয়ে দেবে। বলছি দোকান-বাজারে খরচের কথা।'

'বাজার যা আছে আজ চলে যাবে। দোকানের আর কি কেনার আছে।' রতন নিচু স্বরে বলল।

'দরকার হলে বলো... আর শোন, আমাদের ঘরের কাউকে বলতে যেওনা যে বৌদির অসুখ করেছে, আমি ডাক্তার ডেকে এনেছি।'

'না না, সে আমি বলব না। আর বৌদির ব্যাগ তো ওই পড়ে রয়েছে, ওতেই টাকা আছে... দিদিমনি ডাক্তার কি অসুখ বললেন?'

'এখনো বলেননি। রক্ত পরীক্ষার পর বলবেন। আমি আজ বৌদির স্কুলে যাব। ওর কে বন্ধু আছে তাকে জিজ্ঞেস করবে ওর বাপের বাড়ির ঠিকানা জানে কিনা। আর এই ক্যাপসুলগুলো রইল। তুমি পারবে না, আমি এসে খাইয়ে যাব। থার্মোমিটার টা... দাঁড়াও জ্বরটা দেখি।'

রাহুল উৎকর্ণ হয়ে উঠল। জ্বর কত? আজ নয়তো কাল সকালের মধ্যে রীনা উঠে চলার ক্ষমতা পাবে কি? তা না হলে সে বিরাট বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। পায়খানা দু'দিন চেপে রাখা যাবে কিন্তু তারপর?... না খেয়ে আরও বেশিদিন থাকা যায়। যতীন দাস কত দিন অনশনের পর মারা গেলেন। দু'মাস? তারও বেশি? আমি দু'সপ্তাহ তো থাকতে পারবই। জল তেষ্টা পেলে সে কি করবে? কুঁজোয় অবশ্য ধরা আছে। কিন্তু তাতে কতবার আর খাওয়া যাবে।

তারপর?

মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে রাহুলের। দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক সঙ্গে এতরকম সমস্যার সামনে যে তাকে পড়তে হবে, কখনো সে ভাবতেই পারেনি। তার বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষা, রুচি সবকিছু নস্যাৎ করে দিয়েছে কতগুলো জৈব দাবি, যেগুলোকে সে চিন্তার যোগ্য বলেই কোনদিন মনে করেনি।

'একশ' পাঁচ... বাবা। কাগজ কলম দাও, ডাক্তার বাবু লিখে রাখতে বলেছেন।'

রাহুলের কাছে তাপের পরিমাণটা চিন্তিত হবার মত ঠেকল। কিন্তু তার পেটের অস্বস্তিটাই তাকে অন্য ধরনের চিন্তায় ঠেলে দিল। দু'দিন নয়। আর দু'ঘণ্টাও সে পায়খানা চেপে থাকতে পারবে না।

তিন দিন না পাঁচ দিন, না পাঁচ বছর রাহুল মিনিটের, ঘণ্টার, দিনের হিসাব হারিয়ে ফেলেছে। কুঠুরিটা মল আর মূত্রের দুর্গন্ধে ভরা। ক্ষুধা জিনিসটা যে কি। সেই বোধ এখন আর তার নেই। জল ফুরিয়ে গেছে গতরাতে।

ওরা রীনাকে নিয়ে গেছে নার্সিং হোমে। যতটুকু সে বুঝেছে, কাছাকাছিই সীতাংশুর চেনা একটা নার্সিং হোমে ওকে ভর্তি করানো হয়েছে।

'রতন তোমার কোন চিন্তা নেই। নার্সিং হোমের মালিক আমাদের খুব চেনা, টাকার কথা উনি সেরে উঠুন, পরে হবে। খুব কঠিন অসুখ মাথায় রক্ত উঠে জমে গেছে। দিন রাত বৌদিকে নজরে রাখতে হবে।' সীতাংশু বলেছিল।

'কেন আমি কি পারতুম না।' ক্ষুব্ধ স্বরে রতন বলে।

'পারবে না কেন, তবে ওদের ওখানে যে ভাবে হবে তা তো এখানে হবে না। তুমি যখন খুশি যেও কেমন?'

প্রায় অজ্ঞান রীনাকে ধরাধরি করে, সবাই যখন নীচে নিয়ে গেল তখন রাহুল ভেবেছিল– এইবার, এইবার ছুটে গিয়ে চৌবাচ্চায় মুখ দিয়ে চোঁ চোঁ করে জল খেয়ে আসবে। কিন্তু ভয়ে কুঠুরি থেকে বেরোতে পারেনি। যদি হুট করে কেউ এসে পড়ে? ভয়, ধরা পড়ার ভয়। শুধু এই একটা ব্যাপারই তাকে স্বাভাবিক মানুষের জীবন থেকে সরিয়ে পশুর জীবনে নামিয়ে দিয়েছে।

কয়েকবার বমি করে ছিল রাহুল। তারপর আর তাও হয় না। পেটে কিছু থাকলে তো হবে। হিক্কার মত হয়েছিল, টকটকে লালা থু থু করে ফেলে। সে আশা করেছিল রীনাকে নার্সিং হোমে পাঠালেও শোবার ঘরটা খোলাই থাকবে। কিন্তু রতন তা রাখেনি। দিনের বেলাতেও এই পাড়ায় চুরি হয়েছে, এটা রীনাই ওকে বার বার হুঁশিয়ার করে বলেছে। তারই ফল হল,

যতক্ষণ সে ফ্ল্যাটে থাকে শোবার ঘরের দরজা খোলা রাখলেও নার্সিং হোমে যাবার জন্য যখনই বেরোয় ঘরের দরজাটা শিকল তুলে তালা দিয়ে বন্ধ করে যায়। রাতেও শিকল তুলে দালানে ঘুমোয়। তখন রাহুল শোবার ঘরে বেরিয়ে আসে।

প্রথমবার সে উন্মাদের মত সারা ঘরে খাদ্য খুঁজে ছিল, পায়নি। নতুন কুজোটায় সামান্য তলানি জল ছিল, সেই টুকুই খায়। অদ্ভুত চোখে সে ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল খাট, বিছানা, আলমারি, টেবিল, টিভি, আয়না, রেডিও, বই, জামা কাপড়গুলো যদি ভাত, রুটি, ডাল, তরকারি খাবার জল হয়ে যেত। সে হিসাব করার চেষ্টা করেছিল, মাথার বালিশ দুটো পাউরুটি হয়ে গেলে সে কতদিন চালাতে পারবে। মনে মনে পাউরুটির মত স্লাইস করে তার মনে হয়েছে, দিনে আট স্লাইস করে সতের দিন চালাতে পারবে। সেই সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও মনে হয়েছে– তার মাথা খারাপ হয়ে আসছে।

অন্ধকার কুঠুরিতে মাড়িয়ে ফেলেছিল নিজেরই মল। তুলো দিয়ে ঘষে ঘষে পায়ের আঙুলের ফাঁক থেকে সেগুলো পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ যায়নি। বার বার সে হাত শুঁকেছে, পায়ের কাছে মুখ নিয়ে গেছে। বাসি মলের গন্ধ সারাক্ষণ যেন তার নাকের চারপাশ ঘিরে ভন্‌ভন্‌ করছে। সে অতিষ্ঠ হয়ে বন্ধ দরজাটা বালিশ দিয়ে পিটিয়েছে।

অবশেষে সুযোগ এল। শোবার ঘরে রতন কি যেন খুঁজতে শুরু করল। রাহুল তখন জানালাটা সামান্য ফাঁক করে সকালের রোদের অপেক্ষা করছিল। ন'টা সাড়ে ন'টার আগে সেই তরল সোনা এই ঘরে গড়ায় না। সে ফাঁক দিয়ে দেখছে, রতন খাটের নীচে, আলমারির পিছনে কি যেন খুঁজছে।

হঠাৎই কুঠুরির দরজাটা খুলে গেল। রতনের প্রথমে ঠাওর হয়নি চোখের মাত্র দু'হাত দূরে, এত কাছে দাঁড়িয়ে

থাকা মানুষের অবয়বটিকে। তার চেতনায় দৃশ্যটা ছবি পাঠাতে দেরি করল। রাহুলই প্রথম অসাড় ধাককাটা কাটিয়ে ওঠে, কিছু একটা অবল্মবন চেয়ে হাতটা পাশে বাড়াতেই হাতুড়ির বাঁটটা মুঠোয় পেল। চিন্তার ঢেউ ওঠার আগেই সে তুলে নিল সেটা।

খাটে পা ঝুলিয়ে রাহুল নির্নিমেষে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে। মুখটায় কোন হেরফের নেই। যন্ত্রণার ছাপ বা বিকৃতি কিছুই নেই। রোজ সকালে ঘুম ভাঙিয়ে চা দেবার সময় যেমন থাকত, মুখটা প্রায় সেই রকমই। একটু ব্যস্ততা যেন। উনুনে দুধ চাপিয়ে এসেছে এমন একটা ভাব। এছাড়া রতন খুব স্বাভাবিক ভাবেই মেঝেয় শুয়ে আছে।

হাতুড়িটা খাটের উপর পড়ে। রাহুল সেটা তুলে চোখের সামনে ধরে কৌতূহলি চোখে দেখতে লাগল। সে আশ্চর্যবোধ করল একটা কথা ভেবে, বাঁশের খোঁটার চেয়ে এটা কত ছোট অথচ এটারই ক্ষমতা কত বেশি! মাত্র একটা ঘা দিতেই...।

রাহুল হুঁশিয়ার হয়ে রতনকে পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরের দরজার দিকে এগোল। দালানে এসে পায়ের দিকে তাকাল। না, রক্ত মাড়ায়নি। এইবার তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। সবার আগে জল খেতে হবে।

ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে মুখে দিতে গিয়ে রাহুল থমকে গেল। তার অভ্যাস গ্লাসে ঢেলে খাওয়ার। সে গ্লাসে জল ঢেলে ধীরে পান করল। ঝুড়িতে শুকনো টোম্যাটো, শশা। ডেকচিতে দুধে সর পড়েছে। সে হাসল। এখন নয়, আগে বাথরুমে যাওয়া। অনেক্ষণ ধরে সাবান ঘষবে, দাড়ি কামাবে, শ্যাম্পু করবে, আফটার শেভ গালে লাগাবে। লন্ড্রি থেকে আনা ট্রাউজার্স, শার্ট পড়বে। এখন তার অনেক কাজ।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দেবার পর চাবিটা পকেটে রেখে রাহুল থরথর করে কেঁপে উঠল। পৃথিবীটা যে এত বড়, এই বোধটা সে এখন পাচ্ছে। রতনই তাকে বাঁচিয়ে দিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে মাথাটা তুলে, সামনে চোখ রেখে হাঁটতে শুরু করল। এখন সে যাবে রীনাকে দেখতে। নার্সিং হোমটার নাম সে জানে না, তবে সে জানে বাসস্টপ থেকে মিনিট তিনেক বড় রাস্তা ধরে হেঁটে বাঁ দিকে একটা রাস্তায়।

কেউ কি তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে? অবাক হয়ে যাচ্ছে? দেখুক। কানাকানি, ফিস ফিস হবেই তাকে দেখে। হোক। কেউ তার কাছে এগিয়ে এসে কথা বলবে না। পাড়ায় কারু সঙ্গে তার আলাপ নেই। এখন নার্সিং হোমের ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। সে ওদের কাছে অপরিচিত। নিশ্চয় দারোয়ান কিংবা নার্স জানতে চাইবে 'আপনি কে?' বলব, 'আমি আপনাদের পেশেন্ট রীনা মিত্রর স্বামী।' সন্দেহের চোখে তাকাবে কি? ওরা কি জানে সে এখানকারই একটা মাঠে, এক বর্ষার রাতে.... 'দেখুন, আমি বেটাইমে এসেছি জানি, কিন্তু নিরুপায়... আমাকে এখনই থানায় যেতে হবে, আমার চাকর খুন হয়েছে। আততায়ীকে আমি চিনি, সেটাই থানায় গিয়ে বলব। ... আমি একবার স্ত্রীকে দেখতে চাই, প্লিইজ।'

একা কথা বলতে বলতে, স্বচ্ছন্দে, স্বাভাবিক ভাবে রাহুল হেঁটে যেতে লাগল।